ইউনিট-৩

বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তরায়

অধিবেশন-১: ম্যাশলোর তত্ত্বের ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের মানবীয় চাহিদা পূরণ

অধিবেশন-২ : জেন্ডার সম্পর্কীয় বিবেচ্য বিষয়

অধিবেশন-৩ : সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

অধিবেশন-৪ : গ্রামীণ ও শহর অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী

অধিবেশন-৫ :বিশেষ শিক্ষা চাহিদার শিক্ষার্থী

অধিবেশন-৬ : স্থিতিস্থাপকতা (স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সম্ভাবনা)

ইউনিট-৩ **অধিবেশন–১**

ম্যাশলোর তত্ত্বের ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের মানবীয় চাহিদা পূরণ

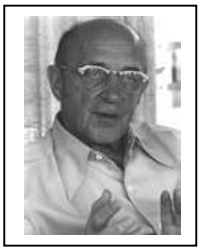

ভূমিকা

সাধারণত বার থেকে ষোল বছর বয়সী ছেলেমেয়েরা অর্থাৎ টিন এজাররা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। এসময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মপ্রকাশের চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা, যৌন চাহিদা, দুঃসাহসিক অভিযানের চাহিদা, নীতি বোধের চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, পেশা বা বৃত্তির চাহিদা ইত্যাদি প্রবল থাকে। শিক্ষার্থীদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে বা তাদের চাহিদা উপেক্ষিত হলে তারা দারুণভাবে মনঃক্ষুন্ন হয় যা তাদের স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করে। এ কথা সত্য যে, তাদের সকল চাহিদা শতভাগ পূরণ করা সম্ভব নয়। তবে এ ক্ষেত্রে তাদের যেসব চাহিদা পূরণ হবার নয়, সেসব ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং অবিভাবকদের সতর্কতার সাথে তাদের চাহিদাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। (যেমন: শিক্ষার্থীদের মজাদার গল্পের বই, খেলাধূলা, গান বাজনা, শিক্ষা ভ্রমণ ইত্যাদি আনন্দমূলক কাজের সাথে যুক্ত রাখলে তা অনেকাংশে যৌন চাহিদা পূরণ করে) শিক্ষক এবং অভিভাবকগণ সচেতন এবং আন্তরিক হলে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদের সার্বিক বিকাশ ত্বরান্বিত করা সম্ভব। বর্তমান অধিবেশনে ম্যাশলোর তত্ত্বের ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের মানবীয় চাহিদা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের মানবীয় চাহিদাসমূহ শনাক্ত করতে পারবেন।
- ম্যাশলো তত্ত্ব উল্লেখ করতে পারবেন।
- ম্যাশলো প্রস্তাবিত 'চাহিদার ক্রমবিকাশ' সম্পর্কিত পিরামিড-এর ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষার্থীদের মানবীয় চাহিদা বিবেচনা ও প্রেষণা সঞ্চারে শিক্ষকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ ম্যাশলোর তত্ত্ব ও ম্যাশলোর প্রস্তাবিত চাহিদার ক্রমবিকাশ

শিক্ষার্থীবৃন্দ, নিচে একটি গল্প উল্লেখ করা হল যাতে পাঁচটি মৌলিক চাহিদার উল্লেখ রয়েছে। আসুন, আমরা গল্পটি পড়ি এবং চাহিদাগুলো মার্কার দিয়ে সনাক্ত করি।

স্ত্রী করিমন বিবি এবং একমাত্র কন্যা মালিহাকে নিয়ে শাহেদ আলী আগার গাঁ বস্তিতে বাস করেন। শাহেদ আলী রিক্সা চালিয়ে যা উপার্জন করেন তাই দিয়ে তাদের সংসার চলে। হঠাৎ শাহেদ আলী সড়ক দূর্ঘটনায় মারা যান। উপার্জনের কোন পথ না দেখে করিমন বিবি বেঁচে থাকার তাগিদে অন্যের বাড়ীতে ঝি এর কাজ শুরু করেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই কাল বৈশাখীর কালো থাবায় তার একমাত্র থাকার কুঁড়ে ঘরটি লন্ডভন্ড হয়ে যায়। এমন সময় বস্তিতে অবস্থিত এনজিও পরিচালিত স্কুলের শিক্ষিকা হাসিনা বেগমের পরামর্শে করিমন বিবি তার মেয়ে মালিহাকে ইয়াতিম খানায় ভর্তির জন্য নিয়ে যান। মাছুমপুর ইয়াতিম খানার তত্ত্বাবধায়ক নাসরিন আক্তার মালিহাকে ভর্তি করে নেন। নাসরিন আক্তার প্রথমে মালিহাকে পেটপুরে দুপুরের খাবার খাওয়ান। বিকেলে তাকে প্রয়োজনীয় পোশাক পরিচ্ছদ কিনে দেন। মালিহা খুব শব্দ করে এবং ঘন ঘন কাশি দিচ্ছিল দেখে সন্ধ্যায় ডাক্তার দেখিয়ে প্রয়োজনীয় ঔষধ পথ্য কিনে দেন। এরপর রাতে দ্বিতীয় তলার ২০৩ নম্বর রুমে তার জন্য একটি সিট বরাদ্দ দেন। পরদিন তত্ত্বাবধায়ক মালিহাকে মাছিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন।

বন্ধুরা, আসুন এবার আমরা শনাক্তকৃত চাহিদাগুলো গুরুত্বের ক্রম অনুসারে নিচের ফাঁকা জায়গায় লিখি।

১।

২।

৩।

৪।

৫।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার আমরা মানবীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে রচিত ম্যাশলোর তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব।

১৯৪৩ সালে 'ম্যাশলো' মানব চাহিদার উপর একটি তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তার তত্ত্বের মূল কথা হল "মানুষ প্রথমে তার মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করে এবং ধীরে ধীরে সে উঁচু মাত্রার চাহিদাগুলো পূরণ করতে চায়।" ম্যাশলো চাহিদার ক্রমবিকাশকে একটি পিরামিডের ৫টি স্তরে স্থান দিয়েছেন।

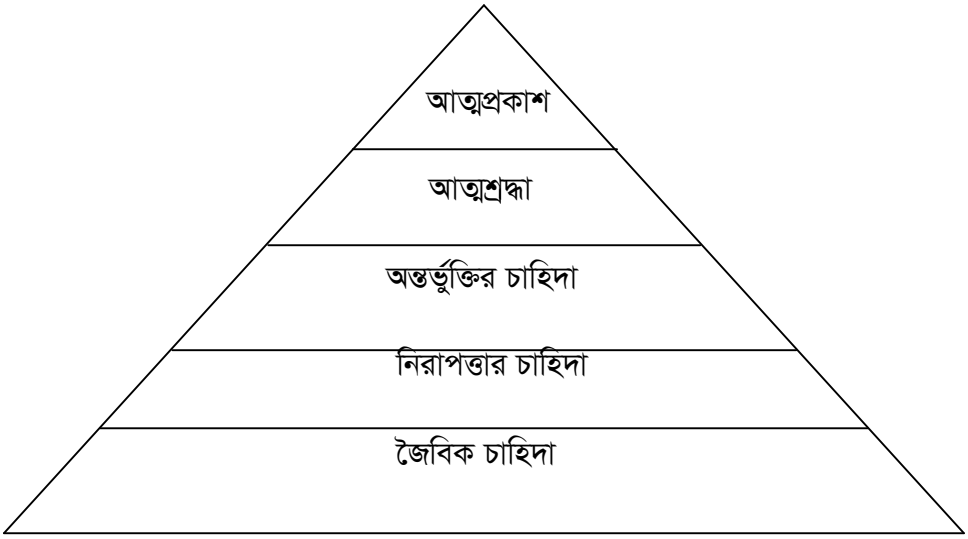

চিত্র ঃ ম্যাশলো প্রস্তাবিত চাহিদার ক্রমবিকাশ

কাজ-১

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসুন নিচের কলামে ক্রম অনুযায়ী ম্যাশলোর মানবীয় চাহিদাগুলো লিখি এবং পাশের কলামে দু'টি করে উদাহরণ লিখি। লেখা শেষ হলে মূল শিখনীয় বিষয়বস্তুর সাথে মিলিয়ে আমাদের উদাহরণের সঠিকতা যাচাই করব।

ক্রমিক	মানবীয় চাহিদা	উদাহরণ
১		
২		
৩		
৪		
৫		

পর্ব-খঃ ম্যাশলোর তত্ত্বের আলোকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মানবীয় চাহিদা বিবেচনা এবং শিখন ও প্রেষণা প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে মানুষের চাহিদার বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বয়ঃসন্ধিকালে পদার্পন করায় এ স্তরের চাহিদা

বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বন্ধুরা, আসুন আমরা মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের চাহিদা নিয়ে তিন মিনিট চিন্তা করি এবং এ স্তরের শিক্ষার্থীরা শিক্ষক, অভিভাবক তথা সমাজের কাছে কী কী প্রত্যাশা করে সেগুলো নিচের ফাঁকা জায়গায় লিখি।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের চাহিদাগুলো শনাক্ত করলাম। এবার আমরা ম্যাশলোর তত্ত্বের আলোকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মানবীয় চাহিদা এবং শিখন ও প্রেষণা প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব।

চাহিদা হচ্ছে প্রেষণার মূল উৎস। মানুষের জীবনে এ চাহিদা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। মনোবিদগণ সাধারণত তিন ধরনের চাহিদার কথা বলেছেন। জৈবিক চাহিদা, মানসিক চাহিদা এবং সামাজিক চাহিদার উপর ভিত্তি করে প্রেষণাকেও ৩টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হল- জৈবিক প্রেষণা, ব্যক্তিগত প্রেষণা এবং সামাজিক প্রেষণা। যে কোন পরিস্থিতিতে এই তিন ধরনের প্রেষণা একত্রে বিভিন্ন স্তরে কাজ (Different Level) করতে পারে।

প্রেষণা ব্যক্তির আচরণকে উদ্দেশ্যমুখী করে তোলে। শিখন শেখানোর প্রচেষ্টাও উদ্দেশ্যমুখী। ফলে উপযুক্ত প্রেষণা সৃষ্টি করতে পারলে তা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শিখনে বিশেষভাবে সহায়তা করতে পারবে। প্রেষণার শিক্ষাগত তাৎপর্য রয়েছে। মানুষের জীবনের জৈবিক চাহিদা শিখন ও সামাজিক প্রভাব দ্বারা নির্ণিত হয়। প্রেষণাকে অভিজ্ঞতা ও শিখন দ্বারা প্রভাবিত করা যায় এবং এদের দ্বারা ব্যক্তিজীবনের মানসিক ও সামাজিক বিকাশের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা একদিকে যেমন প্রেষণা প্রক্রিয়ার উন্নয়ন সম্ভব, তেমনি শিখনের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপযুক্ত প্রেষণা প্রক্রিয়া সৃষ্টিও করা যায়।

শিক্ষকের প্রারম্ভিক দায়িত্ব হবে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখন উপযোগী প্রেষণা জাগ্রত করা। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রেষণা সৃষ্টির জন্য শিক্ষক পুরস্কার প্রদান, মূল্যায়ন করা, প্রশংসা করা, সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি, পারদর্শিতা বিবেচনা করে কাজ প্রদান ইত্যাদি কৌশলগুলি অবলম্বন করতে পারেন।

আলোচ্য প্রেষণা সৃষ্টিকারী কৌশলগুলি ছাড়াও শিক্ষক আরও নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। তবে এ প্রসঙ্গে শিক্ষকের স্মরণ রাখা দরকার তার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সাময়িক প্রস্তুতিকরণে (Readiness) নয়; স্থায়ী প্রেষণা জাগ্রত করা তার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ রেখে, শিক্ষক এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্থায়ীভাবে শিক্ষণের প্রতি আগ্রহী হবে এবং শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণাকে ধরে রাখতে পারবে।

কাজ-১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, প্রেষণার প্রকারভেদ উল্লেখ করুন এবং প্রত্যেক প্রকার প্রেষণার দুটি করে উদাহরণ লিখুন। লেখা শেষ হলে মূল শিখনীয় বিষয়বস্তুর সাথে মিলিয়ে দেখুন আপনার ধারণা ঠিক আছে কি না।

কাজ-২

মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের প্রেষণা জাগ্রত করণে একজন শিক্ষক কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন তা একটি পোস্টার পেপারে লিখুন এবং পরবর্তী টিউটোরিয়াল ক্লাসে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে আপনার ধারণাকে আরও সমৃদ্ধ করুন।

ইউনিট-৩ অধিবেশন-১

মূল শিখনীয় বিষয়

ম্যাশলোর তত্ত্বের ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের মানবীয় চাহিদা পূরণ

ম্যাশলোর চাহিদার ক্রমবিকাশ

১৯৪৩ সালে 'ম্যাশলো' মানব চাহিদার উপর একটি তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তার তত্ত্বের মূল কথা হল "মানুষ প্রথমে তার মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করে এবং ধীরে ধীরে সে উচুঁ মাত্রার চাহিদাগুলো পূরণ করতে চায়।"

ম্যাশলো চাহিদার ক্রমবিকাশকে একটি পিরামিডের ৫টি স্তরে স্থান দিয়েছেন।

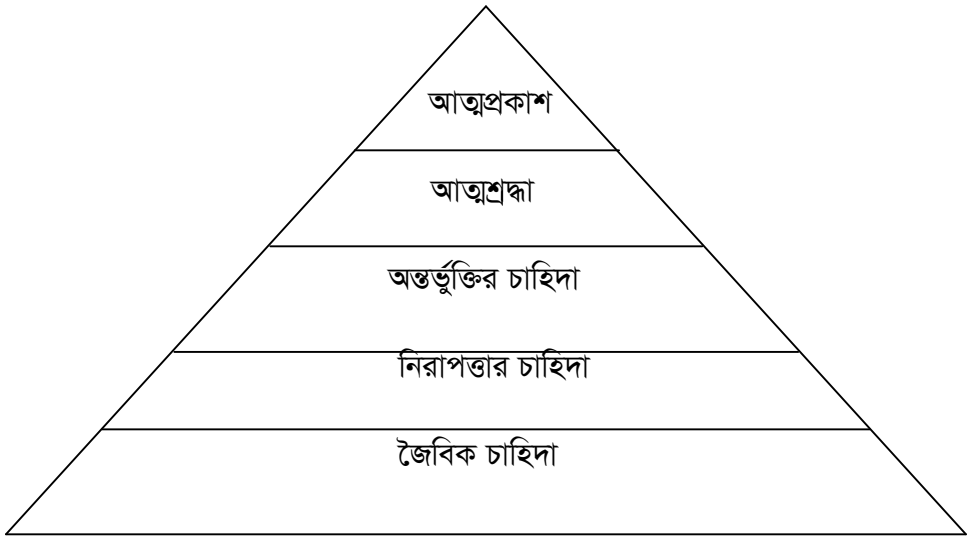

চিত্র ঃ ম্যাশলো প্রস্তাবিত চাহিদার ক্রমবিকাশ

স্তরগুলো হলো ঃ

১. জৈবিক চাহিদা
২. নিরাপত্তার চাহিদা
৩. ভালবাসা, স্নেহ (অন্তর্ভুক্তির চাহিদা)
৪. আত্মশ্রদ্ধা
৫. আত্মপ্রকাশ

১. জৈবিক চাহিদা/ মানসিক চাহিদা

নিচের চাহিদাগুলোর সমন্বয়ে জৈবিক চাহিদা গঠিত হয়।

- শ্বাসপ্রশ্বাস
- পানি

- খাদ্য
- দেহের বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন
- ঘুম
- শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ
- স্বাস্থ্য রক্ষা

জৈবিক চাহিদা মানুষের চিন্তা ও আচরণকে প্রভাবিত করে। এর অভাবে মানুষ দুঃখ, বেদনা, অসুস্থতা অনুভব করে। যৌন চাহিদাকেও ম্যাশলো জৈবিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

২. নিরাপত্তার চাহিদা

জৈবিক চাহিদা পূরণ হলে নিরাপত্তার চাহিদা জাগ্রত হয়। নিরাপদ ও নিরাপত্তাকে সকল আশা আকাঙ্ক্ষা বা চাহিদার উপরের স্তরে স্থান দেওয়া হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

- চাকুরির নিরাপত্তা
- আয় ও সম্পদের নিরাপত্তা
- দৈহিক নিরাপত্তা - সহিংসতা, দুষ্কৃতি, বৈরী আচরণ থেকে নিরাপত্তা
- নৈতিক ও জৈবিক/ মানসিক নিরাপত্তা
- পারিবারিক নিরাপত্তা
- স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা

৩. স্নেহ/ ভালবাসার চাহিদা (অন্তর্ভুক্তির চাহিদা)

জৈবিক ও নিরাপত্তার চাহিদার পর তৃতীয় পর্যায়ে মানুষের চাহিদাকে সামাজিক চাহিদা বলা হয়। এর মধ্যে রয়েছে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, যৌন সম্পর্ক এবং পারিবারিক সম্পর্ক। এর অভাবে মানুষ একাকীত্বে ভোগে, সামাজিক দুশ্চিন্তা করে এবং বিষাদগ্রস্ত হয়।

৪. আত্মশ্রদ্ধার চাহিদা

মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধার চাহিদা থাকে। এ চাহিদা আত্মশ্রদ্ধা এবং অন্যকে শ্রদ্ধা করাকেও বুঝায়। আত্মশ্রদ্ধা তখনই আসে যখন মানুষ নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারে। আর এ ভারসাম্য যখন বিনষ্ট হয় তখন মানুষের নিজের প্রতি শ্রদ্ধা কমে যায়, হীনমন্যতায় ভোগে, আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন হয়।

৫. আত্মতৃপ্তি বা আত্মপ্রকাশের চাহিদা

অভাবের চাহিদা মৌলিক চাহিদা হলেও এ চাহিদাকে পূরণ বা প্রশমন করা যায়। আত্মপ্রকাশ বা আত্মতৃপ্তির চাহিদা তখনই আসে যখন সব ধরনের চাহিদা পূরণ হয়ে যায়। এটি মানুষের সহজাত চাহিদা। আত্মপ্রকাশ করতে পারে বা যাদের আত্মতৃপ্তি আছে এমন লোকজন সম্পর্কে ম্যাশলো বলেছেন যে–

- এরা সত্য ঘটনা ও বাস্তবতাকে সহজে গ্রহণ করে।
- এরা তাৎক্ষণিকভাবে কোন ধারণাকে বুঝে কাজ করতে পারে।
- এরা সৃজনশীল।
- এরা যে কোন সমস্যা সমাধানে আগ্রহী; যে কোন ধরনের সমস্যার সমাধান করা তাদের জীবনের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু।
- এরা অন্য লোকের সাথে সহজে মিশতে পারে এবং জীবনের নানা দিকের প্রশংসা করতে পারে।
- এরা মনে প্রাণে নৈতিকতাকে গ্রহণ করে এবং এর জন্য বাইরের কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না।
- এরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে অন্যদেরকে মূল্যায়ন করে। কারো সম্পর্কে আগে থেকেই কোন মতামত দেয় না।

(সূত্র ঃ ইন্টানেট http:/.en.wikipedia.org)

প্রেষণার শ্রেণীবিভাগ

প্রেষণার মুল উৎস চাহিদা (Need) মানুষের জীবনে এ চাহিদা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। মনোবিদগণ সাধারণত তিন ধরনের চাহিদার কথা বলেছেন। জৈবিক চাহিদা (Organic Need), মানসিক চাহিদা (Psychologocal Need) এবং সামাজিক চাহিদা (Social Need) এর উপর ভিত্তি করে প্রেষণাকেও ৩টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। জৈবিক প্রেষণা (Organic or Psychological Motives), ব্যক্তিগত প্রেষণা (Personal Motives) এবং সামাজিক প্রেষণা (Social Motives)। যে কোন পরিস্থিতিতে এই তিন ধরনের প্রেষণা একত্রে বিভিন্ন স্তরে কাজ (Different Level) করতে পারে।

প্রেষণা ব্যক্তির আচরণকে উদ্দেশ্যমুখী করে তোলে। শিখন-শেখানোর প্রচেষ্টাও উদ্দেশ্যমুখী। ফলে উপযুক্ত প্রেষণা সৃষ্টি করতে পারলে তা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শিখনে বিশেষভাবে সহায়তা করতে পারবে। প্রেষণার শিক্ষাগত তাৎপর্য রয়েছে। মানুষের জীবনের জৈবিক

চাহিদা শিখন ও সামাজিক প্রভাব দ্বারা নির্ণিত হয়। প্রেষণাকে অভিজ্ঞতা ও শিখন দ্বারা প্রভাবিত করা যায় এবং এদের দ্বারা ব্যক্তিজীবনের মানসিক ও সামাজিক বিকাশের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা একদিকে যেমন প্রেষণা প্রক্রিয়ার উন্নয়ন সম্ভব, তেমনি অন্যদিকে শিখনের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপযুক্ত প্রেষণা প্রক্রিয়া সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে।

১। জৈবিক প্রেষণা

মানুষের জৈবিক চাহিদাগুলি থেকে যে প্রেষণার সৃষ্টি হয়, তাদের বলা হয় জৈবিক প্রেষণা (Organic or Psychological Motives)। মানুষের জীবন ধারণের জন্য এ চাহিদাগুলি একান্তভাবে প্রয়োজন। পানি, আলো, বাতাস, খাদ্য, আশ্রয় ইত্যাদির চাহিদা জন্মগতভাবে থাকে এবং এগুলি ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। আমাদের পরিবেশের এইসব চাহিদা সহজে চরিতার্থ করার ব্যবস্থা আছে। ফলে এসব চাহিদাকে কেন্দ্র করে খুব সহজে প্রেষণাটি জাগ্রত হয়। শুধুমাত্র আপতকালীন অবস্থায় আলো, বাতাস পানি খাদ্য ইত্যাদির মত জৈবিক চাহিদাকে কেন্দ্র করে প্রেষণা জাগ্রত হয়। জৈব চাহিদাগুলির মধ্যে যৌন চাহিদাকে (Sex Need) কেন্দ্র করে মানুষের জীবনে সচেতন উদ্দেশ্যমুখী প্রেষণা জাগ্রত হয়। শিখন ও সামাজিক প্রভাব দ্বারা যৌন প্রেষণার গতি নির্ধারিত হয়। যৌন প্রেষণার বিকাশ কৈশোরের প্রথমে শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। কুড়ি বছর বয়সের মধ্যে এ প্রেষণা স্থায়ীভাবে গড়ে উঠে এবং এ সময়ে এ শক্তি সবেচেয়ে বেশি থাকে। এর পর আস্তে আস্তে কমতে থাকে। যৌন প্রেষণা ব্যক্তির সামাজিক ও মানসিক বিকাশে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। যৌন প্রেষণার এই বৈশিষ্ট্য অন্যান্য জৈবিক প্রেষণার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মানুষের জীবনে জৈবিক চাহিদাগুলি একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হলেও তাদের সঙ্গে যুক্ত প্রেষণার তাৎপর্য অপেক্ষাকৃত কম। তাহলে আমাদের স্মরণ রাখা দরকার, এইসব প্রেষণাকে অভিজ্ঞতা ও শিখন দ্বারা প্রভাবিত করা যায় এবং এদের দ্বারা ব্যক্তি জীবনের মানসিক ও সামাজিক বিকাশের ধারাকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

২। ব্যক্তিগত প্রেষণা

মানুষের আত্মসচেতনতাকে কেন্দ্র করে তার মধ্যে কতগুলো চাহিদা দেখা দেয় এগুলোকে সাধারণ অর্থে মানসিক চাহিদা (Psychological Need) বলা হয়ে থাকে। এ চাহিদাগুলোর সাথে যুক্ত বা বিশেষভাবে আত্মসচেতনতার সাথে যুক্ত প্রেষণাগুলোকে বলে ব্যক্তিগত প্রেষণা (Personal Motives)। মানুষের আত্মসচেতনতামূলক চাহিদার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, আত্মশ্রদ্ধা চাহিদা (Need for self esteem)। মনোবিদ ম্যাশলো (Maslow) বলেছেন, "All people need a stable, firmly based high evaluation of themselves." এই চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির মধ্যে আত্মশ্রদ্ধার প্রেষণা (Esteem Motive) জাগ্রত হয়। এ প্রেষণা ব্যক্তিকে তার আত্মমর্যাদা রক্ষার অনুকূল আচরণ সম্পাদনে প্রবৃত্ত করে। শিশুর আত্মসচেতনতা ও অহং সম্পর্কে (Self Concept) প্রাথমিক স্তরে তার বাবা, মা ও অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রের যেমন বিস্তৃতি হয়, সেই সাথে তার অহংসত্ত্বা সম্পর্কে ধারণারও বিস্তৃতি হয়। ফলে, আত্মশ্রদ্ধার প্রেষণাও ক্রমে সীমিত বস্তু থেকে বৃহত্তর লক্ষ্য অভিমুখী হয়। এ কারণে, অন্যান্য প্রেষণার মত আত্মশ্রদ্ধার প্রেষণা জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। কৈশোরে এই প্রেষণা সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়। এই ধরনের প্রেষণা স্থায়িত্ব লাভ করলে ব্যক্তির মধ্যে আত্মনির্ভরতা ও স্বাধীনভাবে কাজ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া, যেসব কাজ করলে অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাবে, সর্বসমক্ষে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা যাবে; সেসব কাজের প্রতি মনোযোগী হওয়ার প্রবণতাও ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়। এই আত্মশ্রদ্ধার প্রেষণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আর এক ধরনের প্রেষণার কথা মনোবিদ "ম্যাশলো" বলেছেন। এর নাম হল আত্মপ্রকাশের প্রেষণা(Self Actualization Motive)। প্রত্যেক মানুষ চায়, তার মধ্যে যা কিছু ক্ষমতা ও সম্ভাবনা আছে তাকে বাস্তবে রূপদান করতে, অর্থাৎ আত্মপ্রকাশের চাহিদা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে থাকে। মনোবিদ বার্নার্ড (Barnard) বলেছেন, "What a person can be, he must be his potentialitiees to be actualized". এই চাহিদা ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতার প্রভাবে ব্যক্তির মধ্যে আত্মপ্রকাশের প্রেষণা (Self Actualization

Motive) সৃষ্টি করে। অনেক মনোবিদ একে পারদর্শিতার প্রেষণা (Activement Motive) হিসেবে নামকরণ করেছেন। এই ধরনের অত্মপ্রকাশের প্রেষণা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে ব্যক্তির অন্যান্য চাহিদাগুলি সঠিকভাবে পরিতৃপ্ত হওয়া দারকার। এই ধরনের প্রেষণার প্রবলতাও কৈশোরে দেখা যায়।

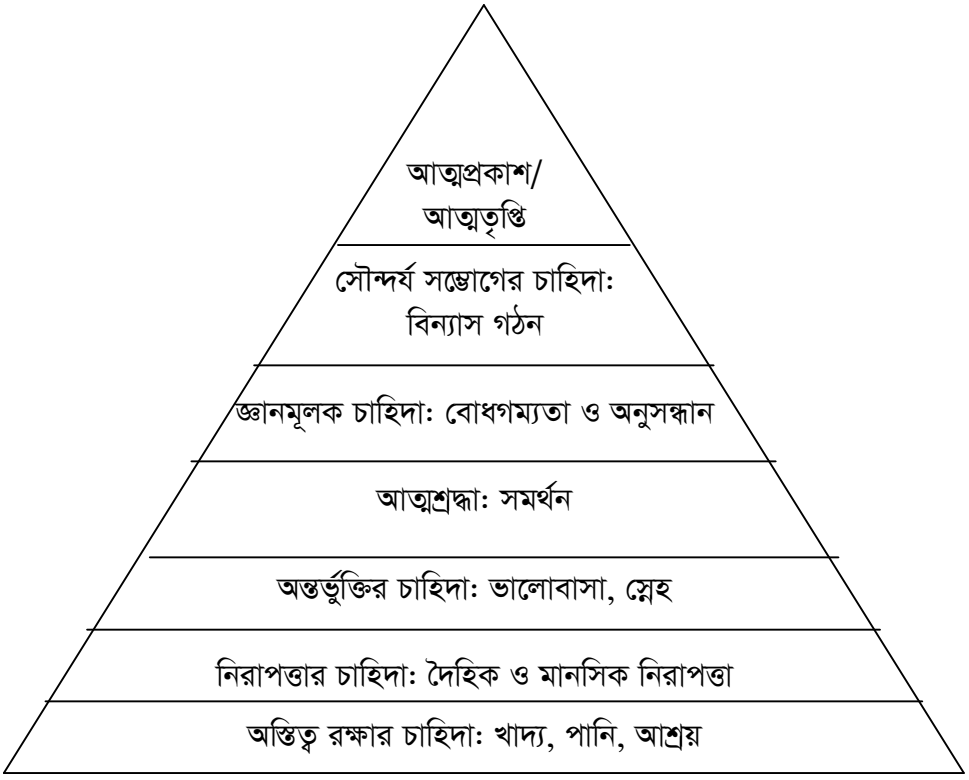

চিত্র ঃ ম্যাশলো (Maslow) প্রস্তাবিত চাহিদার ক্রমবিকাশ (Highererchy Need)

আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মপ্রকাশের প্রেষণা বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে জটিল হতে থকে এবং ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও সামাজিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এ দু'ধরনের প্রেষণা শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই ব্যক্তিগত প্রেষণাগুলির একটি সামাজিক তাৎপর্যের দিকও আছে। এ জাতীয় প্রেষণামূলক কাজের মাধ্যমে ব্যক্তি একদিকে তার ব্যক্তিগত চাহিদাগুলিকে পরিতৃপ্ত করে অন্যদিকে একই সঙ্গে সে সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখে। কোন কোন সময় এসব আচরণ আংশিকভাবে তার এই দুই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করে। এই ধরনের মধ্যবর্তী আচরণ যা ব্যক্তিকে সঙ্গতি বিধানে সহায়তা করে, তাকেই কার্ট লিউইন বলেছেন (Kurt Lewin) বলেছেন Vector facing। সুতরাং এ জাতীয় ব্যক্তিগত প্রেষণা সৃষ্টি করাও আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য।

৩। সামাজিক প্রেষণা

মানুষ সামাজিক জীব। কতগুলো সামাজিক চাহিদা পরিতৃপ্তির মাধ্যমে সুস্থ-সামাজিক জীবন যাপন করা সম্ভব হয়। নিরাপত্তা (Safety or Accurity), ভালোবাসা, (Love or Affection), সংযুক্তি (Belongings) ইত্যাদির চাহিদা এই শ্রেণীভূক্ত। এই ধরনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রেষণা জাগ্রত হয় তাদের বলা হয় সামাজিক প্রেষণা (Social Motive)। এই ধরনের প্রেষণা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজের আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে আচরণ সম্পাদনে প্রবৃত্ত করে। অর্থাৎ সামাজিক প্রেষণা জাগ্রত হওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির সামাজিক বিকাশ হয়। সামাজিক প্রেষণাগুলো বিশেষভাবে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার প্রভাবে গড়ে ওঠে। শিশুর জীবনে সামাজিক চেতনা আসার সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের প্রেষণার বিকাশ আরম্ভ হয়। শিশুর সামাজিক অভিজ্ঞতা পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থকে, তাই এই সময় প্রেষণাগুলোও বিশেষভাবে পারিবারিক আচরণগুলোর গতি নির্ধারণ করে। ক্রমে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার সামাজিক ক্ষেত্র বিস্তৃত হতে থাকে। তখন সে তার দলের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তির প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে আরম্ভ করে। বৃহত্তর সমাজ পরিবেশে তার আদর্শ গড়ে উঠতে আরম্ভ করে। এই সমাজ আদর্শগুলিকে লক্ষ্য (Goal) হিসেবে বিবেচনা করে ব্যক্তির আচরণ নির্দিষ্ট পথে প্রভাবিত হয়। এ ধরনের সামাজিক প্রেষণার জাগরণই ব্যক্তির সামাজিক পরিণমনের (Social Maturity) সূচক।

অতএব তিন শ্রেণীর প্রেষণা একেবারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। এগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। মানুষের আচরণ এতই জটিল যে তাকে সহজভাবে কোন এক শ্রেণীর প্রেষণার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। যে কোন পরিস্থিতিতে এই তিন ধরনের প্রেষণাই একত্রে বিভিন্ন স্তরে কাজ করতে পারে। খাদ্যবস্তুর চাহিদায় (Need for food) মানুষ যে প্রেষণামুলক আচরণ করে, তার দ্বারা একই সঙ্গে তার ব্যক্তিগত চাহিদা ও সামাজিক চাহিদা পরিতৃপ্ত হতে পারে। ফলে, একই সঙ্গে ঐ ব্যক্তির মধ্যে কিছু কিছু ব্যক্তিগত প্রেষণা ও সামাজিক প্রেষণা কাজ করে। সুতরাং এ পরিস্থিতিতে ব্যক্তির লক্ষ্যমুখী আচরণের গতি তিন ধরনের প্রেষণার সমবেত ফল দ্বারা নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রেষণা বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জটিলতা লাভ করে এবং মানুষের বহুমুখী উদ্দেশ্যমূলক আচরণের গতি নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে এইসব প্রেষণার গুরুত্বের

কথা মনে রাখতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা যেমন প্রেষণা প্রক্রিয়ার উন্নয়ন সম্ভব, তেমনি অন্যদিকে শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে উপযুক্ত প্রেষণা প্রক্রিয়া সৃষ্টিরও প্রয়োজন আছে।

শিখন ও প্রেষণা প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষক হিসেবে আমাদের প্রারম্ভিক দায়িত্ব হবে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখন উপযোগী প্রেষণা জাগ্রত করা। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রেষণা সৃষ্টির জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত কৌশলগুলি অবলম্বন করতে পারেন।

১। পুরস্কার

উপযুক্ত পুরস্কারের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রেষণা জাগ্রত করতে পারেন। পুরস্কার সাংকেতিক ধরনের (Symbolic) হতে পারে বা মূর্ত বস্তুও (Concrete Object)) হতে পারে। পুরস্কার মূর্ত বা বিমূর্ত বস্তর মাধ্যমে দেওয়া হোক না কেন তার থেকে ধীরে ধীর যাতে অন্তঃজ প্রেষণা জাগ্রত হয়, সেদিকে শিক্ষককে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ প্রেষণা যদি স্বয়ংক্রিয় (Automatic) না হয়, তাহলে শিখনও স্বতঃস্ফুর্ত হবে না।

২। মূল্যায়ন

বিদ্যালয়ে শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির মূল্যায়ন তাদের শিখনমূলক প্রচেষ্টায় প্রেষণা যোগায়। আমরা সাধারণত যে পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করে থাকি, তার দ্বারা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত পারদর্শিতার তুলনামূলক বিচার করি। এই পদ্ধতিতে কোন কোন শিক্ষার্থী উচ্চ মান লাভ করে; ফলে তারা শিখনসহায়ক কতকগুলি সু-অভ্যাস গড়ে তোলে। কিন্তু, এইসব অভ্যাস শিক্ষার্থীদের মনে স্থায়ী কোন মনোভাব গড়ে তুলতে পারে না। শিক্ষার্থীদের প্রেষণা জাগ্রত করতে হলে আমাদের মূল্যায়ন ব্যবস্থারও পরির্তন করতে হবে। দলভুক্তির চাহিদা (Need for Belongingness), আত্মশ্রদ্ধার চাহিদা (Self Esteem) এবং আত্মতৃপ্তির চাহিদা (Need for self Actualization) যাতে পরিতৃপ্ত হয়, সে অনুযায়ী মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ

প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে যাতে তার নিজস্ব চাহিদা ও ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করা যায়, সে ব্যবস্থা করতে পারলে প্রত্যেকেই উদ্দেশ্যমুখী কাজে আগ্রহান্বিত হবে।

৩। সফলতা

কোন বিশেষ কাজে সফলতা ব্যক্তিকে অনুরূপ কাজে প্রবৃত্ত করে। সফলতার চাহিদার (Need for sucess) পরিতৃপ্ত করতে না পারলে শিক্ষার্থীর শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষ এবং সামগ্রিক উভয় ধরনের উদ্দেশ্যকেই বর্জন করবে। এজন্য বিদ্যালয়ে শিখনমূলক পরিস্থিতিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে তাদের ব্যক্তিগত বৈষম্য অনুযায়ী সফলতা লাভ করতে পারে, সে বিষয়ে শিক্ষককে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার্থীর নিজের সফলতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা তাকে পরবর্তী শিখনমূলক কাজে অনুপ্রাণিত করে। একথা স্মরণ রেখে শিক্ষক শ্রেণীতে পাঠ্য বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি নির্বাচন করবেন।

৪। প্রশংসা

প্রশংসা শিক্ষার্থীদের কাছে ভাষামূলক পুরস্কার (Verbal Reward) হিসেবে কাজ করে। ফলে, তাদের মধ্যে প্রেষণার সঞ্চার করে। অবশ্য ভাষার ব্যবহার ছাড়াও নানাভাবে সাংকেতিক পদ্ধতিতে পুরস্কার দেওয়া যায়। প্রশংসা শিক্ষার্থীদের আত্মশ্রদ্ধার চাহিদা পরিতৃপ্তিতে সহায়তা করে।

৫। সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা

শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার (Co-operation and Competition) মনোভাব শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণার সঞ্চার করে। পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মনোভাব শিখনের ক্ষেত্রে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার ব্যক্তিগত সীমিত ক্ষমতাকে পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করে। পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কাজে ও দলগত প্রভাবে শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা বাড়ে। সেজন্য শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণা জাগ্রত করতে হলে, শিক্ষক এই দুই ধরনের কৌশলই ব্যবহার করবেন।

৫। পারদর্শিতার আকাঙ্ক্ষা

সবশেষে, শিক্ষার্থীদের প্রেষণা জাগ্রত করতে হলে, তাদের জন্য এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে যা তাদের সমস্ত রকম চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হল– তাদের পারদর্শিতার আকাঙ্ক্ষা (Level of Aspiration)। তাই পাঠ্যবিষয়বস্তু অবশ্যই যেন শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার আকাঙ্ক্ষার

উপযোগী হয়। হ্যাবিংহার্স্ট (Habinghurst) বলেছেন, "আমরা যদি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জৈবিক, মানসিক এবং সামাজিক চাহিদার পরিতৃপ্তির উপযোগী পাঠ্য বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে পারি, তাহলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রেষণা সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে"। সুতরাং শিক্ষার্থীদের প্রেষণা জাগ্রত করার জন্য উপরোক্ত নীতির কথা স্মরণ রেখে আমাদের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে।

আলোচ্য প্রেষণা সৃষ্টিকারী কৌশলগুলি ছাড়াও শিক্ষক আরও নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। তবে এ প্রসঙ্গে শিক্ষকের স্মরণ রাখা দরকার তার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সাময়িক প্রস্তুতিকরণে (Readiness) নয়; স্থায়ী প্রেষণা জাগ্রত করা তার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ রেখে শিক্ষক এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্থায়ীভাবে শিখনের প্রতি আগ্রহী হবে এবং শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণাকে ধরে রাখতে পারবে। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষক নির্দিষ্ট চারটি পর্যায়ে কাজ করবেন।

প্রথমতঃ তিনি শিক্ষার্থীদের শিখনে আগ্রহ সৃষ্টি করবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের কজে উৎসাহ দিয়ে, এই ধরনের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি শিক্ষার্থীদের বর্তমান ক্ষমতার উপযুক্ত আত্মমূল্যায়নে সহায়তা করার জন্য তাদের সফলতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলবেন। সফলতা সম্পর্কে সচেতনতা তাদের প্রেষণা সঞ্চারে সহায়তা করে।

তৃতীয়তঃ উপযুক্ত পুরস্কার (Reward), প্রশংসা (Praise) ইত্যাদির ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করাও শিক্ষকের দায়িত্ব।

চতুর্থতঃ শিক্ষার্থীদের ভুল আচরণগুলি নিয়ন্ত্রণ করাও শিক্ষকের কর্তব্য। কারণ, কোন বিষয়ের প্রেষণা জন্মগতভাবে থাকতে পারে না। তাই অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়।

মূল্যায়ন

১. মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের মানবীয় চাহিদাসমূহ শনাক্ত করুন ।
২. ম্যাশলো তত্ত্ব আলোচনা করুন।
৩. ম্যাশলো প্রস্তাবিত 'চাহিদার ক্রমবিকাশ' সম্পর্কিত পিরামিড-এর ধাপসমূহ বর্ণনা করুন।
৪. মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষার্থীদের মানবীয় চাহিদা বিবেচনা ও প্রেষণা সঞ্চারে শিক্ষকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক ও খ

কাজ-১ ও কাজ-২

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট-৩ **অধিবেশন-২**

জেন্ডার সম্পর্কীয় বিবেচ্য বিষয়

ভূমিকা

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সমাজবদ্ধভাবে মানুষের বসবাস। সমাজে নারী পুরুষের শারীরিক পার্থক্য থাকলেও অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্যে রয়েছে সম অধিকার। অথচ অতি প্রাচীনকাল থেকেই নারীরা নির্যাতিত, নিগৃহীত এবং বঞ্চিত হয়ে আসছিল। এমনকি এখনও নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের স্বীকার। উন্নত দেশগুলোতে এ বৈষম্য অনেকটা রোধ হলেও উন্নয়নশীল অনেক দেশে এখনও এ বৈষম্য প্রকট রয়েছে। তাই বর্তমান সময়ে জেন্ডার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জেন্ডার বলতে বোঝায় নারী-পুরুষের প্রত্যাশিত আচরণ ও দায়িত্ব, যার উৎপত্তি হয় পরিবার, সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে। এ ধারণাটিতে নারী-পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আচরণ অন্তর্নিহিত আছে যা সমাজ ও অভিজ্ঞতার আলোকে শেখা। সময়ের সাথে সাথে এবং সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার কারণে এটি পরিবর্তিত হতে পারে। সমাজ তথা দেশের উন্নয়নের জন্য তাই জেন্ডার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু অনেকেই জেন্ডার এর আধুনিক ধারণার সাথে পরিচিত নয় এবং অনেকে জেন্ডারকে সেক্স বা লিঙ্গ হিসেবে ধারণা পোষণ করেন। বর্তমান অধিবেশনে তাই জেন্ডার, জেন্ডার ও সেক্সের মধ্যে পার্থক্য এবং জেন্ডার বিবেচনায় রেখে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠদানের উপায় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- ছেলে ও মেয়েদের আচরণিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে পারবেন।
- ছেলে ও মেয়েদের আচরণের পার্থক্য শনাক্ত করতে পারবেন।
- জেন্ডার কী- তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জেন্ডার ও সেক্স এর পার্থক্য লিখতে পারবেন।
- শ্রেণী কক্ষে জেন্ডার বিবেচনায় শিক্ষকের করণীয় বলতে পারবেন

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ জেন্ডার এর ধারণা এবং জেন্ডার ও সেক্সের পার্থক্য

শিক্ষার্থীবৃন্দ, প্রথমে ডান পাশের বক্সটি কাগজ দিয়ে ঢেকে নিন। এবার আমাদের দেশের পুরুষ এবং নারীরা সাধারণত যেসব কাজ করে সেগুলো খাতায় লিখুন। লেখা শেষে কাগজটি সরিয়ে মিলিয়ে দেখুন আপনার লেখা ঠিক আছে কি না?

পুরুষেরা জমি চাষ করে, ফসল কাটে, মাছ ধরে, বাস/ট্রাক/রিক্সা চালায়, নৌকা চালায়। আর মেয়েরা সন্তান লালন পালন করে, রান্না-বান্না করে, ঘর সাজায়, সেলাই করে, কাপড় পরিষ্কার করে ইত্যাদি।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা কি বলতে পারেন নারী পুরুষের কাজের ধরন পৃথক হওয়ার কারণ কি? কারণটি হল জেন্ডার। বন্ধুরা, আসুন আমরা প্রথমেই জেনে নেই জেন্ডার বলতে কি বোঝায়?

জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের পরিচয়; সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত নারী পুরুষের ভূমিকা যা পরিবর্তনীয় এবং সমাজ-সংস্কৃতি ভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। জেন্ডার তাই সমাজে একজন নারী বা একজন পুরুষের পরিচয় বা কার্য নির্দেশ করে। সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা, কর্ম দায়িত্ব, আচরণিক শুদ্ধতা, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি প্রচলিত জেন্ডার সম্পর্কের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

আর লিঙ্গ বা সেক্স হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক কারণে সৃষ্ট নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যসূচক ভিন্নতা, বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের স্বাতন্ত্র্য, কিংবা শরীরবৃত্তীয়ভাবে নির্ধারিত নারী পুরুষের বৈশিষ্ট্য যা জন্মগত এবং অপরিবর্তনীয়।

কাজ-১

জেন্ডার ও লিঙ্গের পার্থক্যগুলো শনাক্ত করুন।

কাজ-২

পুরুষ ও নারীর পৃথক পৃথক পাঁচটি শারীরিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

ক্রমিক নং	পুরুষ	মহিলা
১		
২		
৩		
৪		
৫		

কাজ-৩

বাংলাদেশে যেসব ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় সেগুলো শনাক্ত করুন।

ক

নিচের উক্তিগুলো জেন্ডার না লিঙ্গের সাথে সম্পর্কিত তা ডান পাশের কলামে লিখুন।

ক্রমিক	উক্তি	জেন্ডার/লিঙ্গ
১	পুরুষেরা জমি চাষ করে।	
২	মা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান।	
৩	ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠার প্রবণতা দেখা যায়।	
৪	বাংলাদেশে রিক্সা চালকগণ পুরুষ।	
৫	বাংলাদেশে মেয়েরা সাধারণত সাইকেল চালায় না।	
৬	মেয়েরা সাধারণত ছেলেদের চেয়ে কম খায়।	
৭	ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে কম কাঁদে।	
৮	বাংলাদেশে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে গণিত ও বিজ্ঞানে ভাল করে।	
৯	বাংলাদেশে এস.এস.সি. পাশের হার মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের বেশি।	
১০	মায়ের শিক্ষা বাবার শিক্ষার চেয়ে স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উপর বেশি প্রভাব ফেলে।	
১১	বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা কম পায়।	
১২	পুরুষদের দাড়ি আছে।	
১৩	বহু মেয়ে রক্তস্বল্পতায় ভোগে।	
১৪	দরিদ্র দেশে/ সমাজে/ পরিবারে ছেলেদের শিক্ষাকে মেয়েদের শিক্ষার চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়।	
১৫	মেয়েদের চুল সাধারণত ছেলেদের চেয়ে বড় হয়।	
১৬	ছেলেদের পা সাধারণত মেয়েদের চেয়ে বড় হয়।	
১৭	বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে যায়।	
১৮	মহিলাদের চেয়ে পুরুষরা সাধারণত বেশি খায়।	
১৯	বাংলাদেশে বেশিরভাগ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক পুরুষ।	
২০	মেয়েদের জন্য বাইরে একা যাওয়া প্রায়শই বিপদজনক।	

পর্ব-খ জেন্ডার সমতা রক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেণী কক্ষে শিক্ষকের করণীয়

শিক্ষার্থী বন্ধরা, আসুন আমরা গল্পটি মনোযোগ দিয়ে পড়ি এবং অন্তর্নিহিত কারণ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করি।

ছালমা আক্তার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ের শিক্ষক। তাঁর উচ্চারণ, কণ্ঠস্বর ও বাচনভঙ্গি ভাল। তার পাঠদানের পদ্ধতি ও কৌশল খুবই ভাল। তিনি যত্নশীল হয়ে রস দিয়ে বাংলা বিষয় উপস্থাপন করেন। কিন্তু তিনি ছাত্রীদের দিকে বেশি মনোযোগ দেন, তাদের প্রশ্ন করেন এবং তাদের প্রশংসা করেন। এ আচরণের জন্য ছাত্ররা তাঁর উপর দীর্ঘদিন ধরে বিরক্ত। একদা নবম শ্রেণীতে পাঠদানের শুরুতে সুনয়নাকে বাড়ীর কাজ আদায়ের দায়িত্ব দিলে ঐ শ্রেণীর first boy হাসান বিরক্ত হয় এবং বলে, "ম্যাডাম আপনি সবসময় ছাত্রীদের Prefer করেন! এটা ঠিক না"। সেসময় ছালমা আক্তার কিছু অযৌক্তিক কথা বলে হাসানকে শান্ত রেখে পাঠদান শেষ করেন। ক্লাস শেষে সকল ছাত্র একত্রিত হয়ে হেড মাস্টার সাহেবের কাছে ছাত্রীদের প্রতি ছালমা আক্তারের পক্ষপাতিত্বের কথা জানান।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন ভাল পাঠদান করা সত্ত্বেও ছালমা আক্তারের বিরুদ্ধে ছাত্ররা কেন অভিযোগ করল। হ্যাঁ বন্ধুরা, কারণ একটাই তা হল 'ছাত্রীদের প্রতি ছালমা আক্তারের পক্ষপাতিত্ব'। বন্ধুরা, ছাত্রীদের প্রতি ছালমা আক্তারের এই পক্ষপাতিত্বই হল পাঠদানে জেন্ডার বৈষম্য। তাই পাঠদানকালে শিক্ষককে অত্যন্ত সতর্ক থেকে জেন্ডার সমতা রক্ষা করতে হয়। পাঠদানকালে জেন্ডার বৈষম্য দেখা দিলে সে পাঠদান ফলপ্রসূ হবেনা; বরং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব দানা বেঁধে উঠবে।

কাজ-১

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসুন পাঠদানে জেন্ডার সমতা রক্ষার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় আমরা এবার সেগুলো শনাক্ত করি এবং লেখা শেষে মূল শিখনীয় বিষয়ের সাথে মিলিয়ে দেখি।

ইউনিট-৩ অধিবেশন-২

মূল শিখনীয় বিষয়

জেন্ডার সম্পর্কীয় বিবেচ্য বিষয়

জেন্ডার এর ধারণা

অভিধানে জেন্ডার শব্দটি কোন বিশেষ্য বা বিশেষ্য বাচক শব্দের লিঙ্গ বা লিঙ্গহীনতা চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ব্যাকরণেও জেন্ডার শব্দটি ব্যবহৃত হয় লিঙ্গ চিহ্নিত করার জন্য। যেমন- পু লিংঙ্গ, স্ত্রী লিঙ্গ, ক্লিব লিঙ্গ ইত্যাদি। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানে জেন্ডার শব্দের ভিন্ন ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান পার্থক্যকে চিহ্নিত করতে সমাজ বিজ্ঞানীরা জেন্ডার শব্দটিকে ব্যবহার করেন। সেজন্য জেন্ডার এবং লিঙ্গকে আপাতঃ দৃষ্টিতে সমার্থক মনে হলেও এর ব্যবহারিক পার্থক্য অনেক। এ কারণে জেন্ডার ও লিঙ্গ এই প্রত্যয় দু'টির ব্যাখ্যা পরিষ্কারভাবে জানা দরকার।

লিঙ্গ বা সেক্স হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক কারণে সৃষ্ট নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যসূচক ভিন্নতা, বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের স্বাতন্ত্র্য, কিংবা শরীরবৃত্তীয়ভাবে নির্ধারিত নারী পুরুষের বৈশিষ্ট্য যা জন্মগত এবং অপরিবর্তনীয়। আর জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের পরিচয়; সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত নারী পুরুষের ভূমিকা যা পরিবর্তনীয় এবং সমাজ-সংস্কৃতি ভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

জেন্ডার তাই সমাজে একজন নারী বা একজন পুরষের পরিচয় বা কার্য নির্দেশ করে। সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা, কর্ম দায়িত্ব, আচরণিক শুদ্ধতা, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি প্রচলিত জেন্ডার সম্পর্কের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। উদাহারণস্বরূপ, আমাদের সমাজে প্রচলিত জেন্ডার ধারণায় নারীরা হলো কোমল হৃদয়ের অধিকারী, আবেগ প্রবণ, শান্ত, নম্র, আর পুরুষেরা হবে কঠোর, যুক্তিবাদী ইত্যাদি। এ ছাড়াও সমাজে নারী ও পুরুষের কাজ-কর্ম নির্ধারণ করে জেন্ডার। যেমন- রান্না-বান্না, সন্তান লালন পালনসহ ঘরের কাজ হল নারীর কাজ, আর আয় উপার্জন, বিচার, শালিশ, রাজনীতি ইত্যাদি বাইরের কাজ হল পুরুষের । কিন্তু এ সব বিষয়গুলি দেশ, কাল, সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। এর উদাহরণ ইউরোপীয় যে কোন দেশের নারী ও পুরুষ এবং বাংলাদেশের নারী ও পুরুষের কাজের মধ্যে তুলনা করলেই স্পষ্ট

বোঝা যায়। ইউরোপের একজন নারী এবং বাংলাদেশের একজন নারী উভয়েই একই লিঙ্গ অর্থাৎ তারা উভয়েই নারী কিন্তু তাদের কাজ, ভূমিকা, আচার-আচরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি অনেকাংশেই ভিন্ন। আর এ বিষয়গুলি নির্ধারণ করেছে সমাজ। তাই সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে বিষয়গুলি নির্ধারণ করেছে সমাজ। তাই সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে নির্ধারিত, অর্পিত নারী-পুরুষের কর্ম, দায়িত্ব, প্রত্যাশিত আচরণ, ভূমিকা ইত্যাদিতে পরিবর্তন ঘটে।

'মেয়ে' বা 'নারী' এই শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গকে বোঝা যায়। কিন্তু যখন 'মেয়েলী' শব্দটি ব্যবহার করা হয় বা বলা হয় তখন তা জেন্ডারকে নির্দেশ করে- যা একজন নারীর লিঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে আরো অনেক কিছুই প্রকাশ করে যা কিনা সামাজিকভাবে সৃষ্ট। কিন্তু জেন্ডার সেক্স/ লিঙ্গ এর পরিণতি নয়। কেননা নারীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য কখনও তার সারাজীবন গৃহকর্মে আবদ্ধ থাকার কারণ হতে পারে না; কিংবা তা তার বাইরের কাজে অংশগ্রহণের জন্য কোন বাধাও নয়। একইভাবে পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য তার গৃহকর্ম সম্পাদনে কোন বাধা নয়। এই বাধা বা বিধির সৃষ্টি সমাজে যা কি-না নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র, বিচরণ ক্ষেত্র, আচরণ, দায়-দায়িত্ব ইত্যাদিকে সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা করে রেখেছে আর এটাই হচ্ছে জেন্ডার। জেন্ডার তাই নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য, ভিন্নতা বা স্বাতন্ত্র্য যা সমাজসৃষ্ট। এক কথায় জেন্ডার হচ্ছে নারী-পুরুষের মধ্যকার সমাজ সৃষ্ট সম্পর্ক এবং লিঙ্গ হচ্ছে নারী ও পুরুষের জন্মগত বা জৈবিক বৈশিষ্ট্য।

জেন্ডার হল সমাজসৃষ্ট, আরোপিত, সমাজ-সংস্কৃতি ভিত্তিক, আচার-আচরণগত এবং স্থান-কাল ভেদে বিভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতিতে পরিবর্তনীয়। আর সেক্স/ লিঙ্গ হল- প্রাকৃতিক-শারীরিক/ বৈশিষ্ট্য, পূর্ব-নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়।

Gender (জেন্ডার)	বলতে বোঝায় নারী-পুরুষের প্রত্যাশিত আচরণ ও দায়িত্ব, যার উৎপত্তি হয় পরিবার, সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে। এ ধারণাটিতে নারী-পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আশা- আকাঙ্ক্ষা, আচরণে অন্তর্নিহিত আছে যা সমাজ ও অভিজ্ঞতার আলোকে শেখা। সময়ের সাথে সাথে এবং সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার কারণে এটি পরিবর্তিত হতে পারে। এ ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটি সমাজ-কাঠামোয় বিরাজমান নারীদের অধস্তন অবস্থাকে বিশ্লেষণে সহায়তা করে। সমাজে নারীদের এ অধস্তন অবস্থা পরিবর্তন ও নিরসনযোগ্য। কেননা এটি জৈবিকভাবে পূর্ব-নির্ধারিত; চিরদিনের জন্যে নির্ধারিত নয়।
Sex বা লিঙ্গ	**এটি হচ্ছে একজন মানুষের জৈবিক পার্থক্য যা জন্মগতভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে।**

জেন্ডার ও সেক্স এর তুলনা

জেন্ডার (Gender)	Sex বা লিঙ্গ
সামাজিকভাবে গড়ে উঠা নারী-পুরুষের পরিচয়, সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক / সমাজ কর্তৃক আরোপিত নারী-পুরুষের ভূমিকা।	প্রাকৃতিক বা জৈবিক কারণে সৃষ্ট নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যমূলক ভিন্নতা বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের স্বাতন্ত্র্য।
মানব সৃষ্ট সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয় সংশ্লিষ্ট।	শরীরবৃত্তীয়/ শরীর সম্পর্কিত যা জন্মগতভাবে নির্ধারিত।
পরিবর্তনশীলঃ এটি সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন সংস্কৃতি, সমাজে এমনকি পরিবার থেকে পরিবারে ভিন্নরূপ প্রকাশ করে।	নির্দিষ্ট, অপরিবর্তনীয় এবং পৃথিবীর সর্বত্র একই।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষককে তাই জেন্ডারের দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে। জেন্ডার বিবেচনায় তাদের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে এবং উভয়ের আচরণিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় এনে তাদেরকে পরিচালনা করতে হবে। মেয়েরা সাধারণত ছেলেদের তুলনায় ভীত, লাজুক, শান্তও নম্র প্রকৃতির হয়ে থাকে। যে শ্রেণীতে ছেলে ও মেয়ে পড়াশোনা করে সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় মেয়েরা শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপ ও কার্যাবলিতে এবং প্রশ্ন উত্তরে অংশগ্রহণে ছেলেদের তুলনায় পিছিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষককে দৃষ্টি রাখতে হবে যে, ছেলে ও মেয়ে উভয় যেন সমভাবে শ্রেণীর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। সকলকে সমভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে শিক্ষককে। অনুরূপভাবে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিতেও উভয়কে সমানভাবে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। পাঠদান পরিচালনায় জেন্ডার বিবেচনায় শিক্ষকের করণীয়ঃ

১. শ্রেণীকক্ষের ডানে, বামে, সামনে ও পিছনের শিক্ষার্থীর প্রতি সমানভাবে দৃষ্টি রাখবেন।

২. শ্রেণীতে শুধুমাত্র ছেলে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রভাব বিস্ড়র করতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

৩. বিশেষ কোন শিক্ষার্থী বা দল যাতে প্রভাব বিস্তার না করে সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

৪. শ্রেণীতে মেয়েদের জন্য ছেলেদের মত যথেষ্ট জায়গা বরাদ্দ করবেন।

৫. ছেলেমেয়ে উভয়ের কাজ সমানভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।

৬. শ্রেণীতে দলনেতা নির্বাচনে ছেলে ও মেয়েকে সমানভাবে দলনেতার দায়িত্ব দিবেন।

৭. দলগত কাজে ছেলেমেয়ে উভয়ের সমান সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

৮. জেন্ডার নিরপেক্ষ শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করবেন।

৯. শ্রেণীতে জেন্ডার নিরপেক্ষ উদাহরণ দিবেন।

১০. জেন্ডার নিরপেক্ষ ভাষা ব্যবহার করবেন। (যেমন- শিক্ষার্থী, হেড টিচার, সভাপতি ইত্যাদি)।

১১. দলগত কাজে সকল শিক্ষার্থীর অধিক অংশগ্রহণ ও কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করবেন।

১২. সকল শিক্ষার্থীকে হাত তুলে শিক্ষকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে উৎসাহিত করবেন।

১৩. ছেলেমেয়ে উভয়ের মতামতকে সমান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন।

১৪. ছেলেমেয়ে উভয়ের প্রতি সমানভাবে দৃষ্টি বিন্যাস করবেন।

১৫. ছেলেমেয়ে উভয়কেই নাম ধরে ডাকার চেষ্টা করবেন।

১৬. সব শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

১৭. শ্রেণীকক্ষের বাইরেও ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের সাথেই যোগাযোগ বজায় রাখবেন।

সূত্র ঃ ১. Boys and literacy – Teaching Units By Nola Alloway and Gilbert.
২. Gender Package - PROMOTE

মূল্যায়নঃ

১। জেন্ডার কী- তা ব্যাখ্যা করুন এবং জেন্ডার ও সেক্স এর পার্থক্যগুলো আলোচনা করুন।

২। শ্রেণীকক্ষে জেন্ডার বিবেচনায় শিক্ষকের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক

কাজ-১, ২ ও৩

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

কাজ-৪

নিচের উক্তিগুলো জেন্ডার না লিঙ্গের সাথে সম্পর্কিত তা ডান পাশের কলামে লেখা হলো।

ক্রমিক	উক্তি	জেন্ডার/লিঙ্গ
১	পুরুষেরা জমি চাষ করে।	জেন্ডার
২	মা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান।	লিঙ্গ
৩	ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠার প্রবণতা দেখা যায়।	লিঙ্গ
৪	বাংলাদেশে রিক্সা চালকগণ পুরুষ।	জেন্ডার
৫	বাংলাদেশে মেয়েরা সাধারণত সাইকেল চালায় না।	জেন্ডার
৬	মেয়েরা সাধারণত ছেলেদের চেয়ে কম খায়।	লিঙ্গ
৭	ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে কম কাঁদে।	লিঙ্গ
৮	বাংলাদেশে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে গণিত ও বিজ্ঞানে ভাল করে।	জেন্ডার
৯	বাংলাদেশে এস.এস.সি. পাশের হার মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের বেশি।	জেন্ডার
১০	মায়ের শিক্ষা বাবার শিক্ষার চেয়ে স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উপর বেশি প্রভাব ফেলে।	জেন্ডার
১১	বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা কম পায়।	জেন্ডার
১২	পুরুষদের দাড়ি আছে।	লিঙ্গ
১৩	বহু মেয়ে রক্তস্বল্পতায় ভোগে।	জেন্ডার
১৪	দরিদ্র দেশে/ সমাজে/ পরিবারে ছেলেদের শিক্ষাকে মেয়েদের শিক্ষার চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়।	জেন্ডার
১৫	মেয়েদের চুল সাধারণত ছেলেদের চেয়ে বড় হয়।	লিঙ্গ
১৬	ছেলেদের পা সাধারণত মেয়েদের চেয়ে বড় হয়।	লিঙ্গ
১৭	বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে যায়।	লিঙ্গ
১৮	মহিলাদের চেয়ে পুরুষরা সাধারণত বেশি খায়।	লিঙ্গ
১৯	বাংলাদেশে বেশিরভাগ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক পুরুষ।	জেন্ডার
২০	মেয়েদের জন্য বাইরে একা যাওয়া প্রায়শই বিপদজনক।	জেন্ডার

পর্ব-খ, কাজ-১

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন ।

ইউনিট-৩ অধিবেশন-৩

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

ভূমিকা

একই রাষ্ট্রে বসবাস করা সত্ত্বেও মানুষের ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয় এবং এ পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। রাষ্ট্রীয় আনুগত্য স্বীকার করার পর রাষ্ট্রই মূলত ব্যক্তির ধর্ম, কর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির স্বাধীনতা প্রদান করে থাকে। তবে রাষ্ট্রের অভ্যন্ড়রে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, ভাষাভাষীর সংখ্যা সমান হয় না। কোন ধর্মের বা সম্প্রদায়ের জনবল বেশি আবার কোন কোন ধর্মের বা সম্প্রদায়ের জনবল কম থাকে। যে ধর্ম/সম্প্রদায়/বর্ণের জনবল কম থাকে তাদেরকে বলা হয় সংখ্যালঘু। সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ উভয় গোষ্ঠী একে অপর থেকে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখে। অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর স্বার্থ-সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী প্রভাবশালী সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর ন্যায় সুযোগ সুবিধা পেয়েও তারা নিজেদেরকে অবহেলিত, নিকৃষ্ট বা হেয় প্রতিপন্ন মনে করে থাকে।

বাংলাদেশ মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, শিখ, আদিবাসী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। এদের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, শিখ, আদিবাসী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোকদের সংখ্যালঘু হিসেবে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘুরা নানা সমস্যার সম্মুখীন। শিক্ষা ক্ষেত্রেও তাদের সুযোগ সুবিধার অভাবসহ নানা সমস্যা বিদ্যমান। শিক্ষা ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত পূর্বক তা সমাধান করতঃ শিক্ষার যথাযথ সুযোগ সৃষ্টি করে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব যা জাতীয় উন্নয়নের সচল চাকাকে আরও গতিশীল করবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- সংখ্যালঘু কাদেরকে বলা হয় এবং বাংলাদেশে কারা সংখ্যালঘু- তা বলতে পারবেন।
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক স্ড়রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কী কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- মাধ্যমিক স্তরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ সংখ্যালঘুর ধারণা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সৃষ্টির কারণ ও বৈশিষ্ট্য

শিক্ষার্থীবৃন্দ, প্রথমে নিচের ডান পাশের বক্সটি কাগজ দিয়ে ঢেকে নিন। এবার বাম পাশের ফাঁকা জয়গায় বাংলাদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নাম লিখুন। লেখা শেষ হলে বক্সের লেখার সাথে মিলিয়ে দেখুন, আপনার লেখা ঠিক আছে কি না?

মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, শিখ, আদিবাসী ইত্যাদি

বন্ধুরা, আপনারা কি বলতে পারেন এসব ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কারা সংখ্যা গরিষ্ঠ? হ্যাঁ বন্ধুরা, মুসলমানেরা সংখ্যা গরিষ্ঠ। তাহলে বাকী ধর্মাবলম্বীদের আমরা কি বলে আখ্যায়িত করে থাকি? হ্যাঁ উত্তরটি আাপনাদের সবারই অতি পরিচিত; আর তা হচ্ছে সংখ্যালঘু।

একই রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, ভাষাভাষীর লোক বসবাস করে। যে ধর্ম/সম্প্রদায়/বর্ণের জনবল কম থাকে তাদেরকে বলা হয় সংখ্যালঘু। এফ. জে. ব্রাউন (F.J. Brown) তার One America গ্রন্থে বলেছেন, "যে কোন বৃহৎ সমাজ বা দেশের অভ্যন্ড়রে বসবাসরত এক দলগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু বলা হয় যারা ঐ দেশের আর্থ-রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী দ্বারা শাসিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়।

যুদ্ধে পরাজিত বা যুদ্ধবন্দীরা, স্থানীয় অধিবাসী বা সভ্যতার অগ্রযাত্রায় পিছিয়ে আছে এমন জনগোষ্ঠী, পেশা, ধর্ম বা বর্ণের দিক দিয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণ সাধারণত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত হয়। এরা সংখ্যায় কম হওয়ায় সমাজ বা রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জোরালো প্রভাব রাখতে পারেনা এবং অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠের দ্বারা তাদের অধিকার খর্ব হয়।

কাজ-১ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুজন ব্যক্তির প্রার্থনার একটি দৃশ্য

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসুন আমরা সংখ্যালঘু হওয়ার কারণ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো শনাক্ত করি এবং লেখা শেষে মূল শিখনীয় বিষয় পড়ে আমাদের ধারণাকে স্পষ্ট করি।

পর্ব-খঃ মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা এবং তা সমাধানের উপায়

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা পূববর্তী পর্বে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সৃষ্টির কারণ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছি। এ পর্বে আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং এসব সমস্যা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সেসব সনাক্ত করব ।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসুন আমরা নিচের বামপাশের কলামে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে সংখ্যালঘুদের সমস্যা এবং ডান পাশের কলামে তা সমাধানের উপায়গুলো লিখি। লেখা শেষে মূল শিখনীয় বিষয়বস্তুর সাথে মিলিয়ে আমাদের ধারণাকে আরও সমৃদ্ধ করি।

কাজ-১

ক্রমিক	মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে সংখ্যালঘুদের সমস্যা	সমাধানের উপায়
১		
২		
৩		
৪		
৫		
৬		
৭		

ইউনিট-৩ অধিবেশন-৩

মূল শিখনীয় বিষয়

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মের এবং সংস্কৃতির জনগণ বাস করে। তারা তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করেই জীবন যাপন করে। কোন কোন ধর্মের বা সংস্কৃতির জনবল বেশি আবার কোন কোন সংস্কৃতির ও ধর্মের জনবল থাকে কম। বাংলাদেশ সংখ্যালঘু হিসাবে আদিবাসী, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের জনবলকেই বুঝানো হয়েছে। এফ. জে. ব্রাউন (F.J. Brown) তার One America গ্রন্থে বলেছেন, "যে কোন বৃহৎ সমাজ বা দেশের অভ্যন্তরে বসবাসরত এক দলগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু বলা হয় যারা ঐ দেশের আর্থ-রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী দ্বারা শাসিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়।" আমাদের দেশে যে সংস্কৃতির ও ধর্মের জনবল কম তাদেরকেই সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও আমরা সবাই বাংলাদেশী।

সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে উপজাতিরা সমতল ও পাহাড়ে বাস করে। সমতলে বসবাসকারী উপজাতিরা হচ্ছে সাঁওতাল, রাখাইন, মগ এবং পাহাড়ে বসবাসকারী উপজাতিরা হচ্ছে- মণিপুরি, ত্রিপুরা, খাসিয়া, কুকি, চাকমা, মারমা, গারো, হাজং ইত্যাদি। এ সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষায় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও নিজস্ব জীবনধারা রয়েছে। ফলে তারা মূল জনগোষ্ঠী থেকে স্বকীয়তা বজায় রাখতে আগ্রহী। শিক্ষা সম্পর্কেও এরা সচেতন নয় এবং উপজাতিদের আর্থিক অবস্থাও ভাল নয়। ফলে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে আগ্রহী নয়। এদের মধ্যে কিছু আছে কৃষি কাজ ও শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। আবার কিছু আছে যারা শিকার, কৃষি কাজ ছাড়াও অন্যান্য উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

সংখ্যালঘুদের মধ্যে বড় অংশটি হল হিন্দু। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা হল উচ্চবর্ণের এবং অন্যরা হল নিম্নবর্ণের। এদের মধ্যে ধর্মীয় বিধান মতে তাদের কাজ বিভাজিত থাকায় নিম্নবর্ণের হিন্দুরা অতীতে পড়াশুনা করত না। পড়াশুনা, চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই ছিল একচেটিয়া উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অনুকূলে। তাছাড়া বিবাহ এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের ব্যাপারেও ছিল আলাদা। তবে বর্তমানে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে।

আদিবাসীদের বংশগত ও পেশাগত কারণে এবং নিকটস্থ বিদ্যালয় না থাকায় তারা শিক্ষা থেকে দূরে রয়েছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার কারণ

১. যুদ্ধে পরাজিত বা যুদ্ধবন্দীরা সংখ্যালঘু হিসেবে পরিচিত লাভ করে।
২. স্থানীয় অধিবাসী বা সভ্যতার অগ্রযাত্রায় পিছিয়ে পড়ে থাকার কারণে।
৩. পেশা, ধর্ম, জাতি বা বর্ণভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।
৪. নব্য প্রতিষ্ঠিত কোন জাতি, রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণ করতে গিয়ে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের কোন বিশেষ জনগোষ্ঠী দুই দেশের রাজনৈতিক ভু-খন্ডের আওতায় পড়ে উভয় দেশের সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য

১. প্রভাবশালী সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা এরা সংখ্যালঘু বলে বিবেচিত।

২. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যবৃন্দ সংখ্যায় কম।

৩. সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ উভয় গোষ্ঠী একে অপর থেকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখে।

৪. অনেকক্ষেত্রে একটি সাধারণ অভিযোগ হচ্ছে যে, সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর স্বার্থ- সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে থাকে।

৫. সংখ্যাগরিষ্ঠদের অনেকে আবার সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে পারে।

৬. ইউরোপীয় শ্বেতকায় নরগোষ্ঠীর লোক কৃষ্ণকায় ও মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর দেশে সংখ্যালঘু হিসেবে বাস করে।

৭. সংখ্যালঘু গোষ্ঠী প্রভাবশালী সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর ন্যায় সুযোগ সুবিধা পেয়েও তারা নিজেদেরকে অবহেলিত, নিকৃষ্ট বা হেয় প্রতিপন্ন মনে করতে পারে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংখ্যালঘুদের সমস্যা

১. বিদ্যালয়গুলিতে ধর্ম শিক্ষার জন্য সব সময় সব ধর্মের শিক্ষক পাওয়া যায় না ফলে অন্য ধর্মের শিক্ষক দিয়ে পড়ানোর ফলে বিষয়বস্তুর স্পষ্টতা থাকে না।

২. পাঠ্যপুস্তক শিক্ষক নির্দেশিকায় সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভাষা ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিফলন বেশি থাকে। সংখ্যালঘুরা থাকে সাধারণত উপেক্ষিত।

৩. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমাজের বিভিন্ন দিক পাঠ্যপুস্তকে বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত হয় না। ওদের Culture ও অন্যান্য কার্যক্রম Modified হয়ে পাঠ্যপুস্তকে আসে।

৪. সংখ্যায় কম বলে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর অসুবিধা হয়।

৫. সংখ্যালঘু বলে সমাজের বিভিন্ন কার্যক্রমে সমানভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় না।

৬. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা রকম ধর্মীয় বিধি নিষেধ থাকায় তারা শিক্ষায় অনগ্রসর।

৭. একজন ছেলে বা মেয়ে বিদ্যালয়ে না যেয়ে যদি অন্য কাজ করে তাহলে সংসারের কিছুটা আয় হয়। অভিভাবকরাও সেই আয়টাকে সাময়িকভাবে বড় মনে করে ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে চায়না এবং উৎসাহীও হয় না।

৮. আদিবাসীরা পাহাড়ে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে এবং এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব খুবই কম। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে বিদ্যালয়ের সংখ্যা অপ্রতুল এবং সেগুলো অনেক দূরে অবস্থিত। বাসস্থান থেকে বিদ্যালয় দূরে হওয়ায় তারা পড়াশুনায় আগ্রহী হয় না। তাছাড়া যাতায়াত ব্যবস্থাও সুবিধাজনক নয়।

৯. আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষা ও কৃষ্টি রয়েছে। কিন্তু ওদের লেখাপড়ার মাধ্যম হল বাংলা। অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঠিকমত বাংলা ভাষা পড়তে, লিখতে ও বলতে পারে না। এজন্য তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহী হয় না।

১০. আদিবাসীদের বিভিন্ন জন বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিয়োজিত এবং পূর্ব থেকেই তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে যার জন্য বংশগত কারণে পরিবারে শিক্ষার পরিবেশ না থাকায় পরবর্তী প্রজন্মের লোকজন লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী হয় না।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংখ্যালঘুদের সমস্যার সমাধানের উপায়

১. বিভিন্ন কাজে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মত সমান সুযোগ দেওয়া দরকার।

২. পাঠ্যপুস্তকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালগিষ্ঠদের সমান প্রতিফলন থাকা দরকার।

৩. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে সহানুভূতিশীল মনোভাব পোষণ করা দরকার।

৪. সকল কার্যক্রমে সকলকে সমান সহযোগিতা দেয়া দরকার।

৫. সংখ্যালঘুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার জন্য সরকারি প্রচার ও মোটিভেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার।

৬. পর্যাপ্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

৭. প্রাথমিক স্তরে তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় বই রচনা করা প্রয়োজন ।

৮. সংখ্যালঘুদের বিনামূল্যে বই ও অন্যান্য শিখন সামগ্রী সরবরাহ করা প্রয়োজন।

সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিজেদের উৎকৃষ্ট ভাবার বা সংখ্যালগিষ্ঠদের দয়া দেখাবার কোনই কারণ নেই। অপরপক্ষে, সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর নিকৃষ্ট ভাবার বা নিজেদের হেয় মনে করার কোন যুক্তি নেই। সামাজিক সংহতি এবং প্রগতির জন্য সব গোষ্ঠীর জন্যই আনুপাতিক হারে সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার পরিবেশ বজায় রাখলে সংখ্যালঘুদের সমস্যা মেটানো সম্ভব হবে। তবে বাংলাদেশে এখন মোটামুটি সব ধর্মের সমান অধিকার রয়েছে। সাধ্যমত সব ধর্মের জনগোষ্ঠী তাদের ধর্ম সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমানভাবে সমাজে প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। বাংলাদেশে সকল ধর্মের প্রতি উদার মনোভাব থাকায় এদেশে সকল ধর্মের লোক স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চা করতে পারে। হিন্দুদের শারদীয় দূর্গা পূজা ছাড়াও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, উপজাতীয়দের কঠিন চীবর দান ও অন্যান্য অনুষ্ঠান, খ্রীস্টানদের বড় দিন সবাই স্বচ্ছন্দে পালনে সব সময়ই সচেষ্ট থাকে। তাছাড়া চাকুরি ক্ষেত্রে কোটা চালু করা হয়েছে যা তাদের আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির বাহন হবে।

মূল্যায়নঃ

১. সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলতে কী বোঝায়? বাংলাদেশে সংখ্যালঘু কারা- আলোচনা করুন।

২. সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সৃষ্টির কারণগুলো চিহ্নিত করুন।

৩. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করুন।

৪. মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কী কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় তা আলোচনা করুন।

৫. মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক ও খ

কাজ-১ ও ২

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট-৩ **অধিবেশন-৪**

গ্রামীণ ও শহর অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী

ভূমিকা

শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নের হাতিয়ার। শিক্ষা কেবল ব্যক্তি বিশেষের উন্নতির সহায়ক নয়, শিক্ষা এমন এক জনগোষ্ঠী তৈরি করে যা শিল্প, সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজন। Human Development in South Asia প্রতিবেদনে তাই দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে 'Without Education, development can neither be broad-based nor sustained'। শিক্ষা অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিরূপ ভূমিকা রাখে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার দিকে তাকালে তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বিশ্ব ব্যাংক এই আটটি দেশকে HPAE(High Performing Asian Economics) বলে আখ্যায়িত করেছে।

তাই মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি যুগোপযোগী মাধ্যমিক শিক্ষা আজ যুগের দাবি। Lewis একটি স্বল্পোন্নত দেশের জনশক্তিকে মাধ্যমিক গ্রাজুয়েটদের জরুরি প্রয়োজনের কথা বলেছেন। এই উপখাত সেই ধরনের জনশক্তি সরবরাহ করে যারা ম্যানেজার, প্রশাসক, পেশাজীবী, যন্ত্রকারিগর, প্রায় পেশাজীবী (semi-profession) যেমনঃ কৃষিক্ষেত্রে সহায়তাকারী, প্রযুক্তিগত তত্ত্বাবধায়ক, নার্স, প্রকৌশল সহকারী, বুককিপার হিসাবে সেবা প্রদান করে। উপরোল্লেখিত শিক্ষিত শ্রেণী উন্নত কৃষি (জলসেচ ও ভূমি কর্ষণভিত্তিক) ও গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য জনগণকে নতুন দক্ষতা ও জ্ঞান সরবরাহ করতে পারে।

পৃথিবীর অনেক দেশেই ইতোমধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা সার্বজনীন করার কাজ শুরু হয়ে গেছে। কোন কোন দেশে তা সমাপ্তও হয়েছে। অথচ বাংলাদেশ এখন পর্যন্ড় বাধ্যতামূলক প্রথমিক শিক্ষাই নিশ্চিত করতে পারে নাই। আর মাধ্যমিক শিক্ষা এখনও রয়েছে নানা সমস্যায় জর্জরিত। বিশেষ করে গ্রাম এবং শহরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাধ্যমিক গ্রহণের পথ

সমস্যা সঙ্কুল। দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, ধর্মীয় গোঁড়ামী, নিকটস্থ বিদ্যালয়ের অভাব ইত্যাদি কারণে এখনও দেশের একটি বৃহৎ অংশ মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান সকল সমস্যা, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও বৈষম্য নিরসন করে সবার জন্য মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারলে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- গ্রামীণ এলাকায় মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যে যে অসুবিধার সম্মুখীন হয় তা শনাক্ত করতে পারবেন।
- শহর অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয় তা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অসুবিধাসমূহ দূরীকরণের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।
- শহর অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অসুবিধাসমূহ দূরীকরণের উপায় উল্লেখ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ গ্রামীণ এলাকায় মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমস্যা ও তা সমাধানের উপায়

গ্রামীণ এলাকার বিদ্যালয়

শিক্ষার্থীবৃন্দ, বাংলাদেশ গ্রাম প্রধান দেশ। বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। এদের মধ্যে বেশিরভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলা আশু প্রয়োজন। কিন্ডু আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায়

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ সমস্যাসঙ্কুল। নানা প্রতিবন্ধকতার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ব্যাপক পরিমাণ শিক্ষার্থী।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা এবার গ্রামীণ এলাকায় মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে পাঁচ মিনিট চিন্তা করি। এরপর নিচের টেবিলের বাম পাশের কলামে সমস্যা এবং ডান পাশের কলামে তার সম্ভাব্য সমাধান উল্লেখ করি।

কাজ-১

সমস্যা	সমাধান

প্রিয় শিক্ষার্থী, চলুন এবার আমরা এবার মূল শিখনীয় বিষয়ের সাথে আমাদের শনাক্তকৃত সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধান মিলিয়ে দেখি এবং আমাদের ধারণাকে সমৃদ্ধ করি।

পর্ব-খঃ শহর অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা ও তা সমাধানের উপায়

শহর এলাকার বিদ্যালয়

শিক্ষার্থীবৃন্দ, চলুন আমরা নিচের গল্পটি মনোযোগের সাথে পড়ি।

শুকুর আলী রাজ মিস্ত্রীর একজন একজন হেলপার। স্ত্রী আসমা বেগম এবং পাঁচ সন্তান নিয়ে কমলাপুর বস্তিতে একটি টঙঘরে বাস করে। মালেকা তাদের প্রথম সন্তান। সে এনজিও পরিচালিত একটি স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। সে লেখা পড়ায় বেশ ভালো এবং মনোযোগী। ষষ্ঠ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় সে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। শুকুর আলী দিনে যা উপার্জন করে তাই দিয়ে তাদের সংসার কোনমত চলে। ২০০৭ সালের ১৮ই ডিসেম্বর শুকুর আলী কাজ করতে গিয়ে দোতলা থেকে পড়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নেওয়া হলেও তার এক পা আজীবনের জন্য অকর্মণ্য হয়ে যায় অথ্যাৎ সে পঙ্গুত্ব বরণ করে। এমতাবস্থায় সংসার চালানোর দায়ে আসমা বেগম বাসা বাড়ীতে কাজের বুয়া হিসেবে কাজ শুরু করে। কিন্তু এ উপার্জনে সাত জনের ভরণ পোষণ সম্ভব না হওয়ায় আসমা বেগম তার বড় মেয়ে মালেকার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং মালেকার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে এক পর্যায়ে জোর করে গার্মেন্টস্ এর শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে দেয়। আর এভাইে চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় মেধাবী ছাত্রী মালেকার শিক্ষা গ্রহণের পথ; ভেঙ্গে যায় বড় হওয়ার স্বপ্ন।

গার্মেন্টেসে কর্মরত মালেকার একটি দৃশ্য

শিক্ষার্থীবৃন্দ, গল্পে আমরা দেখতে পেলাম দারিদ্র্যের কারণে জীবন যুদ্ধে দু'মুঠো খেয়ে বাঁচার তাগিদে মালেকাকে শিক্ষা জীবনের ইতি টেনে বেছে নিতে হয় জীবিকার পথ। বন্ধুরা,

আমাদের দেশে এরকম অসংখ্য মালেকা নানাবিধ কারণে মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসুন আমরা শহর অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা ও তা সমাধানের উপায় চিহ্নিত করি। লেখা শেষে মূল শিখনীয় বিষয়বস্তুর সাথে মিলিয়ে দেখি এবং আমাদের ধারণাকে আরও সমৃদ্ধ করি।

কাজ-১

শহর অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা	**সমাধানের উপায়**

ইউনিট-৩ অধিবেশন-৪

মূল শিখনীয় বিষয়

গ্রামীণ ও শহর অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী

গ্রাম অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা

বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান দেশ। গ্রামের উন্নতিই দেশের উন্নতি। গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনা ছাড়া গ্রাম উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমাদের দেশের গ্রাম উন্নয়নের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো গ্রাম উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কাজের সমন্বয়ের অভাব। বর্তমানে বাংলাদেশে গ্রাম উন্নয়নে বেশ কিছুসংখ্যক সরকারি ও আধাসরকারি সংস্থা নিয়োজিত রয়েছে যেমন: বিএডিসি, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ইত্যাদি। এত কিছুর পরও গ্রাম-গঞ্জের মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমস্যা দেখা যাচ্ছে যেমন :

১. গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যালয়ে ভৌত সুবিধার অভাব।
২. পয়:প্রণালীর ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়।
৩. গ্রামীণ মানুষের মধ্যে সঞ্চয়হীনতা।
৪. গ্রামীণ মানুষের মধ্যে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার।
৫. জীবন যাত্রার মান নিম্ন।
৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা, বন্যা।
৭. অপুষ্টি, প্রয়োজনে পরিমাণ মত খাবার না খাওয়া।
৮. শিক্ষার্থীদের তুলনায় শ্রেণীকক্ষের অপ্রতুলতা।
৯. উন্নত পাঠাগারের অভাব।
১০. প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব।
১১. নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শনের অভাব।
১২. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অপর্যাপ্ততা।
১৩. সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি পরিচলনার জন্য বস্তুগত ও আর্থিক সুযোগ সুবিধার অভাব।
১৪. শিক্ষকদের বেতন-ভাতাদি আশানুরূপ না থাকায় পেশাগত মনোযোগ কম থাকে।
১৫. উচ্চ মানসম্মত শিক্ষকের অভাব বিশেষ করে ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে।
১৬. শিক্ষার্থীদের বাড়িতে লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা কম যেমন- পড়ার টেবিল, চেয়ার ইত্যাদির স্বল্পতা।
১৭. বিদ্যালয় থেকে বাড়ীর দূরত্ব বেশি হওয়ায় যাতায়াত বেশ কষ্টকর।

১৮. ক্লাসে শিক্ষার্থীর সঙ্গে বেশি সময় হাতে কলমে শিখন (Activity based learning) কৌশল প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

১৯. অভিভাবকগণ অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা তাদের কাছ থেকে তেমন সহায়তা পায় না।

২০. শ্রেণীকক্ষে একঘেয়েমী শিক্ষাদান পদ্ধতি।

২১. গ্রামীণ জনগণের আর্থিক সুবিধা ভাল না থাকার জন্য একই বিষয়ের বিভিন্ন লেখকদের বই না কিনে একজন লেখকের বই কিনে থাকে এবং পড়ে থাকে।

২২. বিদ্যালয় এবং বাসস্থানে বিদ্যুতের ব্যবস্থা না থাকা।

২৩. স্বল্প আয়ের লোকদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ চালানো অসুবিধা।

২৪. তাদের পক্ষে ঠিকমত ভর্তির টাকা এবং মাসিক বেতন দেয়া সম্ভব হয় না।

২৫. দূরবর্তী স্থানে স্কুলের অবস্থান।

২৬. লাইব্রেরী ও বিজ্ঞানাগার না থাকা।

গ্রাম অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা সমাধানের উপায়

১. সকল বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার।

২. সুষ্ঠু পাঠদানের জন্যে প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করা, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করা এবং খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৩. পর্যাপ্ত বইপত্র সংগ্রহ ও সরবরাহের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের উন্নতি বিধান ।

৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা।

৫. শ্রেণী কক্ষের পাঠদানের মান উন্নয়ন করা।

৬. শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত কমাতে হবে। শ্রেণী কক্ষে সর্বোচ্চ অনুপাত হবে ১:৪০।

৭. দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করা।

৮. গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষাক্রমিক, সহ-শিক্ষাক্রমিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার থেকে নির্দিষ্ট হারে অনুদান প্রদান করা দরকার।

৯. স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় ভৌত সুবিধাদি ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা ।

১০. উন্নয়ন কাজের তদারকির জন্য প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষক তথা ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডির সদস্যদের নিয়ে শক্তিশালী উন্নয়ন কমিটি গঠন করা।

১১. শিক্ষার্থীদের উপদেশ ও নির্দেশনার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এবং বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধান জোরদার করা দরকার।

১২. স্কুলের আর্থিক সংকট নিরসনের জন্য সহজশর্তে ঋণ দানের ব্যবস্থা করা।

১৩. শিক্ষকগণ শ্রেণী পাঠদানের ক্ষেত্রে কোন অবস্থায় যেন গাফলতি না করেন এবং পরীক্ষার হলে কোন শিক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বন না করে সেদিকে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার।

১৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থানীয় উদ্যোগ ও সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৫. শিক্ষকদের শূণ্যপদে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নিয়োগ নিশ্চিত করা।

১৬. শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণ বহণ করা।

১৭. রাস্তা ঘাট নির্মান করা।

১৮. গ্রামে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১৯. শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক জোরদারকরণ।

২০. যে এলাকায় বিদ্যালয় অবস্থিত সেই এলাকার জনগণকে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে সকল সমস্যার সমাধান তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করা সম্ভব হয় না তবে সরকার ও জনগণের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে এর সমাধান করা সম্ভব।

গ্রামীন দরিদ্র মহিলার কাজের একটি দৃশ্য

শহরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা

পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলোর গ্রাম থেকে শহরে আগত মানুষের ক্রমাগত ভিড় নানাবিধ জটিল সমস্যার সৃষ্টি করছে।স্থানাভাবে নবাগতদের আশ্রয় নিতে হচ্ছে অপরিকল্পিতভাবে বেড়ে ওঠা শহরতলীতে অথবা বস্তিতে। এসব অঞ্চলে পরিবেশ নোংরা এবং আধুনিক জীবন যাত্রার উপকরণ প্রায় অনুপস্থিত; অশিক্ষা ও দারিদ্র্য এই অধিবাসীদের নিত্য সঙ্গী। শহরে এসেও কাজের অভাবে বেকারত্বকেই তাদের বরণ করে নিতে হয়। ফলে বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়। যেখানে ওদের নুন আনতে পান্তা ফুরায় সেখানে মাধ্যমিক স্তরের লেখাপড়া করা বেশ কষ্টকর। শহর অঞ্চলে এই সমস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমস্যাগুলো হচ্ছে ঃ

১. বাসস্থান সমস্যা
২. নোংরা বস্তি জীবন
৩. পানীয় জলের সমস্যা
৪. জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত; ফলে সংক্রামক ব্যাধির প্রাদূর্ভাব দেখা যায়।
৫. শহরের পয়:প্রণালী, হাট বাজার ইত্যাদি অনেক সময়ই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না।
৬. জনগণের প্রয়োজন মোতাবেক যানবাহন অপর্যাপ্ত।
৭. শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য লেখাপড়ার ব্যাপারে কোন উপ-বৃত্তির ব্যবস্থা নেই।
৮. মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মসংস্থানের সাথে সংযুক্ত নয়; ফলে লেখাপড়া খরচ জোগাতে না পেরে (Droup out হয়) ঝরে পড়ে এবং কোন পেশার সাথে যুক্ত হয়।
৯. টিউশন ফি সময়মত দিতে পারে না।
১০. যাতায়াতের খরচ বেশি।
১১. পরিবার থেকে লেখাপড়ার ব্যাপারে কোন সহযোগিতা পায় না কারণ অভিভাবকগণ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত।
১২. শিখন সামগ্রী (বই, খাতা, কলম, পোষাক, পরিচ্ছদ) খরচ মিটানো কষ্টকর।
১৩. প্রাইভেট টিউশন ফি দেয়া সম্ভব হয় না।
১৪. অনুন্নত ও অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি থেকে রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে।
১৫. টিউশন ও অন্যান খরচ বেশি থাকায় উন্নত মানের বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না।
১৬. অস্বাস্থ্যকর ও অপুষ্টিতে ভোগে বলে অনেক সময় মানসিক হীনমন্যতায় ভোগে।
১৭. সরকার প্রদত্ত স্বাস্থ্য ও সেবা থেকে অনেক সময় থাকে বঞ্চিত।
১৮. আর্থিক সামর্থ্য ভাল না থাকার জন্য বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে।
১৯. পরিমিত ও পুষ্টিকর খাবারের অভাব।

২০. পরিবারের অর্থ সংকটের জন্য অল্প বয়সে কাজের প্রতি আগ্রহী হয় এবং বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে লিপ্ত হয়।

২১. শহরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ সেখানে কোন কার্যকর উদ্যোগ নেই। তাদের সমস্যা সমাধানের কোন বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নেয়া হয় না।

২২. আর্থিক অসুবিধার জন্য শহরে নামী বা ভাল স্কুলগুলোতে ওরা ভর্তি হতে পারে না। কিন্তু নিম্ন আয়ের বা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যালয়ের পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকাতে ইচ্ছে থাকলেও ওরা পড়াশুনা করতে পারে না।

২৩. দরিদ্র জনগোষ্ঠী শিক্ষার গুরুত্ব ভালভাবে বুঝতে পারে না। অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ে পাঠানোর চেয়ে কাজে পাঠানোকেই উত্তম মনে করে থাকে।

শহরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা সমাধানের উপায়

১. রাস্ড়া ঘাট, পয়:প্রণালী, হাট বাজার ইত্যাদি উন্নয়ন সাধন করা দরকার।

২. ছিন্নমূল মানুষের জন্য শহরের বাইরে সুপরিকল্পিত আবাসস্থল নির্মাণ করা দরকার।

৩. বস্ড়িবাসীদের স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য সহজ কিস্তিতে ঋণের ব্যবস্থা করা দরকার।

৪. স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে সরকারি স্বাস্থ্য সার্ভিস সম্প্রসারিত করা ।

৫. বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্নমূখী প্রকল্প গ্রহণ করা ।

৬. শহরাঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করা।

৭. সর্ব সাধারণের জন্য সরকার বর্তমানে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বই পুস্তক সরবরাহ করে থাকেন। এই সরবরাহ বর্তমানে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত করা দরকার। উপরোক্ত সমস্যা সমাধানকল্পে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানবিকতাবোধ সম্পন্ন সুনাগরিক ও দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে যোগ্যতার সঙ্গে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন এবং কার্যকরভাবে নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

মূল্যায়নঃ

১. গ্রামীণ এলাকায় মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় তা শনাক্ত করুন এবং এসব সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দেশ করুন।

২. শহর অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়? এসব সমস্যা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক ও খ, কাজ-১

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট-৩ অধিবেশন–৫

বিশেষ শিক্ষা চাহিদার শিক্ষার্থী

ভূমিকা

যেসব শিক্ষার্থী দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে পৃথক তাদেরকে বোঝানোর জন্য 'বিশেষ শিখন চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী' কথাটি ব্যবহার করা হয়। বিশেষ শিখন চাহিদার শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং শারীরিকভাবে অক্ষম প্রতিবন্ধী। আমাদের মনে রাখতে হবে, এরাও মানুষ। সকলের মত এদেরও মৌলিক অধিকার পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা ও জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। এটা তাদের মৌলিক অধিকার যা আমাদের সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। স্বল্প মাত্রার এসব প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষার শিক্ষার্থীদের সাথে একই বিদ্যালয়ে লেখা পড়া করতে পারে। সামান্য সহযোগিতা ও উৎসাহ পেলে এরাও অনেক শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। শিক্ষকের উচিত, এইসব শিক্ষার্থীদেরকে জানা, তাদের সমস্যা খুঁজে বের করা এবং শিখন সমস্যা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বর্তমান অধিবেশনে বিশেষ শিক্ষা চাহিদার শিক্ষার্থীদের লক্ষণ, তাদের অসুবিধা এবং তাদের শিক্ষাদানে শিক্ষকের করণীয় ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- বিভিন্ন ধরনের বিশেষ শিক্ষা চাহিদার শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের বিশেষ শিক্ষা চাহিদার শিক্ষার্থীদের অসুবিধাসমূহ শনাক্ত করতে পারবেন।
- বিশেষ শিক্ষা চাহিদার শিক্ষার্থীদের শিখন অসুবিধা দূরীকরণে শিক্ষকের পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রেক্ষিতে বিশেষ শিক্ষা চাহিদার শিক্ষার্থীদের অন্যান্য অসুবিধা দূরীকরণে জাতীয়ভাবে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত তা উল্লেখ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ বিশেষ শিক্ষা চাহিদার শিক্ষার্থী এবং তাদের সমস্যা

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আপনি যখন শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করেন তখন কি সকল শিক্ষার্থীকে শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে সমান ক্ষমতা সম্পন্ন পান? বন্ধুরা, নিশ্চয়ই না। কারণ সকল মানুষ সমান ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। জন্মগত কারণে মানুষে মানুষে পার্থক্য দেখা যায়। কেউ কেউ জন্মগত কারণে শারীরিক এবং মানসিক ক্ষেত্রে উত্তম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়; কেউবা স্বাভাবিক প্রকৃতির আবার কেউ কেউ শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে অসম্পূর্ণতা নিয়ে পৃথিবীতে আসে। আবার জন্ম গ্রহণের পর বিবিধ কারণে কারো কারো শারীরিক অথবা মানসিক সমস্যা দেখা দেয় যা তার স্বাভাবিক জীবনের গতিকে ব্যাহত করে। শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসুন আমরা শ্রেণীকক্ষে সাধারণত কী কী ধরনের সমস্যাগ্রস্থ শিক্ষার্থী দেখতে পাই তা নিচের ফাকা জায়গায় লিখি। তার আগে নিচের ডান পাশের বক্সটি কাগজ দিয়ে ঢেকে নেই। লেখা শেষ হলে কাগজটি সরিয়ে মিলিয়ে দেখি আমাদের লেখার সাথে মিল আছে কিনা।

কাজ-১

---

১. বুদ্ধি প্রতিবন্ধী
২. শ্রবণ প্রতিবন্ধী
৩. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী
৪. শারীরিকভাবে অক্ষম প্রতিবন্ধী।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এসব প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বলা হয় বিশেষ শিক্ষা চাহিদার শিক্ষার্থী। এসব শিক্ষার্থী দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে পৃথক। তাই এদেরকে বোঝানোর জন্য 'বিশেষ শিখন চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী' কথাটি ব্যবহার করা হয়। এসব শিক্ষার্থীদের নানা রকম সমস্যা থাকায় তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে সমান তালে চলতে পারেনা। এজন্য শিক্ষকের উচিত তাদের সমস্যাগুলো শনাক্ত করে সেসব ক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা করা।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসুন আমরা এবার বিশেষ শিক্ষা চাহিদার শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলো শনাক্ত করি। লেখা শেষ হলে মূল শিখনীয় বিষয়বস্তুর সাথে মিলিয়ে দেখি এবং আমাদের ধারণাকে আরও সমৃদ্ধ করি।

কাজ-২

শিক্ষার্থীদের ধরন	সমস্যা
বুদ্ধি প্রতিবন্ধী	
শ্রবণ প্রতিবন্ধী	
দৃষ্টি প্রতিবন্ধী	
শারীরিক ভাবে অক্ষম প্রতিবন্ধী	

পর্ব-খঃ বিশেষ শিক্ষা চাহিদার শিক্ষার্থীদের সমস্যা নিরসনে শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসুন আমরা নিচের গল্পটি মনোযোগ দিয়ে পড়ি।

জাবেদ সৈয়দ আকবর আলী হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর একজন মেধাবী ছাত্র। সে গত বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ছোট বেলায় পোলিওতে আক্রান্ত হওয়া তার ডান পা এখন অকর্মণ্য। সে ক্রাচে ভর করে হাটে। জাবেদ লেখা পড়ায় যেমন ভাল তেমনি দুষ্টামিতেও ছিল ওস্ড়াদ। একে কলম দিয়ে খোঁচা দেয়া, ওর কলম কেড়ে নেয়া, ওর চুল টান দেয়া, ওর খাতায় কলমের দাগ দেয়া ইতাদি ছিল তার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এসব দুষ্টামির জন্য সে শিক্ষকদের অনেক বকুনিও খায়। একদিন সুস্মিতা আক্তার দশম শ্রেণীতে ইংরেজি বিষয়ে পাঠদান করছিলেন। হঠাৎ পেছনের বেঞ্চের ছাত্র ফয়সাল দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, "ম্যাডাম, এই খোঁড়াটা আমার কলম কেড়ে নিয়েছে"। ম্যাডাম জাবেদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেই দেখতে পেলেন তার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে অশ্রু ঝরছে। খোঁড়া বলে সম্বোধন করায় সে দারুণভাবে ব্যথিত হয়েছে। সুস্মিতা আক্তার তার কাছে গেলেন এবং মাথায় হাত বুলাতেই সে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল এবং বলল ম্যাডাম আমি খোঁড়া। ম্যাডাম তার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলেন। এরপর শ্রেণীর সবার উদ্দেশ্যে বললেন, পোলিওতে আক্রান্ত হয়ে জাবেদের এক পা অকর্মণ্য হয়েছে। এখানে তার কোন হাত ছিলনা। এটা একটা দুর্ঘটনা যা আমাদের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারত। আর তখন আমাদের যদি কেউ খোঁড়া বলত তখন আমাদের কেমন লাগত-একটু চিন্ড়া করে দেখ। তাই আমাদের উচিত যারাই সমস্যাগ্রস্থ তাদেরকে ভর্ৎসনা না করে সহযোগিতা করা। এবার সকল শিক্ষার্থী সুস্মিতা আক্তারকে বলল, ম্যাডাম আমরা আর কেউ জাবেদকে আঘাত দিয়ে কথা বলব না; বরং সবাই ওকে সাহায্য করব।

শিক্ষাথীবৃন্দ, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের আন্তরিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির উপর পাঠদানের কার্যকারিতা নির্ভর করে। তাই সব সময় সতর্ক থেকে পাঠদান করতে হবে এবং সকল শিক্ষার্থীর প্রতি নজর রাখতে হবে। বিশেষ চাহিদার শিক্ষার্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টি দিয়ে পাঠদান করতে হবে। প্রয়োজনে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা বিশেষ শিখন চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রতি একজন শিক্ষকের করণীয় কী কী তার একটি তালিকা তৈরি করি। তালিকা তৈরি শেষে আমরা মূল শিখনীয় বিষয়বস্তুর সাথে মিলিয়ে দেখি এবং আমাদের ধারণাকে স্পষ্ট করি।

ইউনিট-৩ অধিবেশন-৫

মূল শিখনীয় বিষয়

বিশেষ শিক্ষা চাহিদার শিক্ষার্থী

বিশেষ শিখন চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী

যেসব শিক্ষার্থী দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে পৃথক তাদেরকে বোঝানোর জন্য 'বিশেষ শিখন চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী' কথাটি ব্যবহার করা হয়। বিশেষ শিখন চাহিদার শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছে যেসব শিক্ষার্থী তারা হল :

১. বুদ্ধি প্রতিবন্ধী
২. শ্রবণ প্রতিবন্ধী
৩. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী
৪. শারীরিকভাবে অক্ষম প্রতিবন্ধী।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমস্যা

১. স্বল্প বুদ্ধি প্রতিবন্ধী

স্বল্প বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিখনের গতি সমবয়সীদের তুলনায় খুবই কম। এদের স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হয়, বিষয়বস্তুর প্রতি বেশীক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে না, সবকিছুকে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে দেখে, কৌতূহল প্রবৃত্তি ক্ষীণ হয়। সমবয়সীদের যেসব বিষয়ে অনুরাগ থাকে, এদের তা থাকে না। এরা সমবয়সীদের সাথে মেলামেশা পছন্দ করে না, বয়সে ছোট ছেলেমেয়েদের সাথে মেলামেশা করে।

২. স্বল্প শ্রবণ প্রতিবন্ধী

স্বল্প শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের ভাব বিনিময়ে অসুবিধা হয়। শিক্ষক ও সঙ্গী শিক্ষার্থীদের কথা ভালভাবে অনুসরণ করতে পারে না। কথা শোনার সময় বক্তার মুখের কাছে ঝুঁকে কথা শোনে।

৩. স্বল্প দৃষ্টি প্রতিবন্ধী

স্বল্প দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা শ্রেণীর কার্যাবলি অনুসারণ করতে পারে না। কোন বস্তুকে খুব কাছে নিয়ে দেখে। পড়ার সময় বই চোখের কাছে নিয়ে পড়ে। চক বোর্ডের

স্বাভাবিক লেখা/ অক্ষর আসনে বসে স্পষ্ট দেখতে পায় না। প্রায়ই হোঁচট খেয়ে পড়ে। পড়তে দিলে মাথা ধরে বা ক্লান্ত হয়ে যায়। কেউ কেউ তীর্যকভাবে তাকায় বা কিছু দেখার সময় মাথা কাত করে।

৪. শারীরিক প্রতিবন্ধী

শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পোলিও বা দুর্ঘটনার কারণে কিংবা জন্মগতভাবে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমস্যা থাকে। এতে তাদের চলাফেরা করতে অসুবিধা হয়। অনেক সময় হাত পুড়ে গেলে লেখার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। শরীরের কোন নির্দিষ্ট অঙ্গের হাড় বেড়ে গিয়ে বসার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। অনেক সময় তাদের জন্য বিশেষ ধনের আসন-ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। বোবা, তোতলা শিক্ষার্থী শিক্ষকের বক্তব্য বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করে জেনে নিতে পারে না কিংবা সংকোচ বোধ করে। অনেক সময় এরা লম্বায় সমবয়সীদের তুলনায় খাটো হয়, বিদ্যালয়ের বা শ্রেণীর অন্যান্য কোন শিক্ষার্থী না বুঝে তাদের বিকৃত নামে সম্বোধন করে। যেমন– এই পিচ্চি বা বামন বা নুলা (খোঁড়া) ইত্যাদি। এতে এরা খুবই অসহায় অবস্থায় থাকে। সমবয়সী ও অন্যান্যদের সাথে মিশতে পারে না।

বিশেষ শিখন চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সমস্যা নিরসনে শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিখন সমস্যা শনাক্ত করে তাদের শিখন সমস্যা দূর করবেন। এজন্য তিনি যা করবেন তা হলো:

- প্রতি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা ও তাদের শিখন সমস্যা শনাক্ত করা।
- পিতা-মাতা/ অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ করে প্রতিবন্ধিতার কারণ খুঁজে বের করা।
- বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের এসব শিক্ষার্থীদের সাথে সহযোগিতামূলক আচরণ করা ও শিখনে উৎসাহ সৃষ্টি করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমস্যা শনাক্ত করে শিখন সমস্যা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিখন সমস্যা দূরীকরণে শিক্ষকের ভূমিকা

- স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে প্রায় দুই বছর পিছিয়ে থাকে। তাই বিশেষ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলে এদের ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশে সহায়তা করা যায় না। কারণ এ ধরণের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত পদ্ধতি গ্রহণ করা হলেও কখনই

স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের স্ড়রে আনা সম্ভব হয় না। তবে এরা যেন আত্মনির্ভরশীল পূর্ণবয়স্ক মানুষ হিসেবে বিকাশ লাভ করে সে বিষয়ে চেষ্টা করতে হবে। এদের জন্য শিক্ষকের অত্যন্ত ধৈর্য্যের প্রয়োজন। ঘৃণা ও অবজ্ঞা দিয়ে এদের উন্নত করা যায় না। এদের ব্যক্তিগত পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে হবে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে পারলে তা কার্যকরী হবে। বিষয়বস্তু বার বার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এদের মনোযোগ ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় শিক্ষাকাল কমিয়ে ফেলতে হবে। এসব শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর সঙ্গে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে তাদের শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সুতরাং এদের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

- স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা যাতে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সহজভাবে সম্পাদন করতে পারে, যথাযোগ্য সামাজিক আচরণ করতে পারে এবং তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, শিক্ষার মধ্যে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তারা যেন মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে, সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

আংশিক শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর শিখনে সহযোগিতা প্রদানের জন্য শিক্ষকের ভূমিকা

- এ ধরনের শিক্ষার্থী শিক্ষককে সরাসরি দেখতে না পেলে শিক্ষকের কথা বুঝতে পারে না। কারণ শিক্ষক কথা বলার সময় তার ঠোঁটের নাড়াচাড়া লক্ষ্য করে সে মূল বিষয় বুঝে নেয়ার চেষ্টা করে। এ অবস্থায় শিক্ষককে এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে সবার উদ্দেশ্যে কথা বলতে হবে যেন সকলে তাকে দেখতে পায়।
- কেন শিক্ষার্থী কানে শোনার যন্ত্র (Hearing aids) ব্যবহার করলে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা বা নানাভাবে বিব্রত করতে পারে। এক্ষেত্রে সাধারণত শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুটি নিজেকে সবার কাছ থেকে আলাদা করে রাখতে চাইবে এবং পেছনের বেঞ্চে বসতে শুর" করবে যা তার শিখনে সবচেয়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যেন না ঘটে সে জন্য শিক্ষকের উচিত হবে শ্রেণীর/ বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর সমস্যা সম্পর্কে ধারণা দেয়া। শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুকে যেন সবাই শিখনে সহযোগিতা করে এ ব্যাপারে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

- শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা সবসময়ে একজন ভাল ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে অনুসরণ করে। যদি শিক্ষকের কোন বক্তব্য তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় তাহলে ঐ ভাল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তারা সাহায্য নেয়। তাই শিক্ষক যদি ভালো ও মেধাবী ২/১জনের সাথে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর ভাল সম্পর্ক বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা নিতে পারেন তাহলে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী শিখনের ক্ষেত্রে ততটা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমস্যা দূরীকরণে শিক্ষকের ভূমিকা

- যারা সামান্য বা ক্ষীণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী (Low vision) এদের প্রতি শিক্ষকের বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। প্রয়োজনে তাদের পিতামাতার সাথে কথা বলে তার দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা কী ধরনের তা জেনে সেভাবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
- তাদের বসার জন্য সামনের বেঞ্চে জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে। এতে বোর্ডের লেখা দেখতে তাদের অসুবিধা হবে না।
- শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। এতে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তার প্রতি সহানুভূতিশীল থাকবে এবং যে কোন ধরনের সহযোগিতা করবে।

শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমস্যা দূরীকরণে শিক্ষকের ভূমিকা

শারীরিক প্রতিবন্ধী (Physicaly disabled) শিক্ষার্থীদের নানা ধরনের সমস্যার কথা চিন্তা করে ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন:

- আসবাবপত্র এমনভাবে সাজাতে হবে যেন তাদের মধ্যে কেউ হুইল চেয়ার (wheel chair) ব্যবহার করেও চলাফেরা করতে পারে।
- লেখার বোর্ডটি অপেক্ষাকৃত নিচু করতে হবে যাতে সেও হুইল চেয়ারে বসে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মত লিখতে পারে।
- শিক্ষকের কিছু কিছু বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা মনে আঘাত না পায়। যেমন– শিক্ষক যদি বলেন, যাদের পড়া হয়েছে তারা দাঁড়াও। তাহলে হুইল চেয়ারে বসা শিক্ষার্থীর পক্ষে দাড়ানো সম্ভব হবে না। আবার

শিক্ষক যদি বলেন তাড়াতাড়ি লিখ, যার লেখার সমস্যা থাকে তার পক্ষে তাড়াতাড়ি লেখা সম্ভব হবে না।

শ্রেণী বা বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষার্থী যেন শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুকে কানা, খোঁড়া, বোবা, তোতলা ইত্যাদি বলে সম্বোধন না করে সেদিকে নজর রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের আগে থেকেই তাদের অসুবিধার কথা জানাতে হবে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রকাশের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

মূল্যায়ন

১. বিভিন্ন ধরনের বিশেষ শিক্ষা চাহিদার শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করুন এবং তাদের অসুবিধাগুলোর বিবরণ দিন। ।

২. বিশেষ শিক্ষা চাহিদার শিক্ষার্থীদের শিখন অসুবিধা দূরীকরণে শিক্ষকের পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করুন।

৩. বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রেক্ষিতে বিশেষ শিক্ষা চাহিদার শিক্ষার্থীদের অন্যান্য অসুবিধা দূরীকরণে জাতীয়ভাবে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন- আলোচনা করুন।।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক ও খ

কাজ-১ ও কাজ-২

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট–৩ অধিবেশন–৬

স্থিতিস্থাপকতা
(স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সম্ভাবনাঃ Resiliency)

ভূমিকা

সুখ-দুঃখ এবং আনন্দ-বেদনা নিয়েই আমাদের জীবন। অমরা কখনও আনন্দে ভাসি আবার কখনও বা দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাই। কিন্তু অমরা কেউই দুঃখ চাই না। আমরা না চাইলেও দুঃখ পর্যায়ক্রমে আসবেই। তাই বলা হয়, Well and woe comes by turn অর্থাৎ সুখ-দুঃখ পালাক্রমে আসে। দুঃখ দুর্দশা আসলে অনেক সময় ব্যক্তি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে যা স্বাভাবিক জীবন যাত্রাকে ব্যাহত করে। আবার এ অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক আবস্থায় পদার্পণ করে। দুঃখ দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসাকেই বলা হয় স্থিতিস্থাপকতা। মানুষ কখনই দুঃখমুক্ত হয়ে বা দুঃখ প্রতিরোধ করে জীবন চালাতে পারেনা। তবে কিছু কৌশল প্রয়োগ করে দ্রুত দুঃখাবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে।

বর্তমান অধিবেশনে স্থিতিস্থাপকতার ধারণা, স্থিতিস্থাপকতা কুইজ এবং ব্যক্তিগত স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির সূচক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

উদ্দ্যেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে আপনাদের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- স্থিতিস্থাপকতা কুইজ বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারবেন।
- ব্যক্তিগত স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির সূচকসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ
পর্ব-কঃ স্থিতিস্থাপকতার ধারণা এবং স্থিতিস্থাপকতা কুইজ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন মনোযোগ দিয়ে নিচের গল্পটি পড়ি।

সাদিয়া মা বাবার একমাত্র সন্তান। সিরাজগঞ্জের বড় হামকুড়িয়ায় তাদের বাস। একদিন সকাল বেলা সাদিয়ার মামা-মামী তাদের একমাত্র সন্তান সোহাগকে নিয়ে তাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসেন। বাড়িতে এসেই মামী সাদিয়ার হাতে মিষ্টির পোটলা এবং লাল রঙের একটি আকর্ষণীয় স্কুল ব্যাগ তুলে দেন। মিষ্টি এবং স্কুল ব্যাগ পেয়ে সাদিয়া আনন্দে ছোটাছুটি শুরু করে। এর কিছুক্ষণ পর বাবা সাদিয়াকে এক প্রকার জোর করে স্কুলে দিয়ে আসেন। স্কুল থেকে ফিরে আসার পর মা তাকে মুরগীর মাংস দিয়ে ভাত খেতে দেন। সাদিয়া খেতে খেতে জিজ্ঞেস করে, মুরগীর মাংস কোথায় পেলে মা? উত্তরে মা বলেন, মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য তোমার লাল মুরগীটি জবাই দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে সাদিয়া ভাতের থালা ফেলে দিয়ে হাইমাউ করে কাঁদতে থাকে। মা অনেকক্ষণ ধরে তাকে আশ্বস্থ করতে চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে তাকে তার পছন্দ অনুযায়ী আরও দু'টি মুরগী দেওয়ার আশ্বাস দিলে আস্তে আস্তে সে শান্ত হয়। এরই মধ্যে সমবয়সী মামাত ভাই সোহাগ এসে তাকে একটি লজেন্স দেয় এবং বাগানে খেলতে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। এরপর তারা দুজনে দৌড়ে বাগানে যায় এবং দোলনায় চড়ে।

প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা কি দেখলাম সাদিয়া মিষ্টি এবং স্কুল ব্যাগ পেয়ে আনন্দিত হয়েছিল। আবার তার প্রিয় মুরগি জবাই দেওয়ায় খুব কষ্ট পায় এবং কাঁদতে থাকে। আবার এক পর্যায়ে দুঃখ ভুলে স্বাভাবিক হয়ে আসে। এই যে, দুঃখাবস্থা থেকে স্বাভাবিক হয়ে আসা- এটাকে আমরা কি বলতে পারি? হ্যাঁ বন্ধুরা, স্থিতিস্থাপকতা।

বন্ধুরা, দুঃখ-কষ্টকে উপেক্ষা করে জীবন চালানো সম্ভব নয়। জীবনে কখনও নেমে আসে সুখের ফল্গুধারা; আবার কখনো বা দুঃখের সাগরে বইতে হয় ভাঙ্গা তরী। দুঃখাবস্থায় মানুষ হারিয়ে ফেলে স্বাভাবিক জীবনের ছন্দময় পথ। এ অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসাই হল স্থিতিস্থাপকতা।

প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে দুঃখ, কষ্ট, বেদনা ও বিপদ আসে। এতে নানা ধরনের মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে হয়। গবেষণা থেকে দেখা গেছে, কিছু কিছু বিষয় নিয়ে চিন্তা করলে এ ধরনের সমস্যা থেকে পরিত্রান পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে নিচের বিষয়গুলো পড়ুন। আপনার উত্তর "হ্যাঁ" হলে আনন্দিত হোন এবং উত্তর "না" হলে কি করলে এর উত্তর "হ্যাঁ" তে পরিবর্তন করতে পারেন তা চিন্তা করুন।

১। আদর সোহাগ এবং সহায়তা

– আমার জীবনে আমি এমন অনেক ব্যক্তির সাহচর্যে এসেছি যারা আমাকে নিঃশর্ত ভালোবাসেন, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং আমার মনে হয় তারা আমার জন্যই সেখানে আছেন।

২। সফলতার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা

– আমি জীবনে এমন অনেক ব্যক্তির সন্ধান পেয়েছি যারা বিশ্বাস করেন যে, জীবনে সফলতা লাভ করার মত সক্ষমতা আমার আছে।

৩। অর্থপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ

– আমার সাথে যাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে তারা কোন বিষয়ে আমার পছন্দ, অপছন্দ ও মতামত শোনেন এবং আমার মতামতের মূল্য দেন।

৪। ইতিবাচক অঙ্গীকার

– কর্মক্ষেত্রে/ বিদ্যালয়ের কাজের বাইরেও আমি এক বা একাধিক দলের সাথে (ক্লাব, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় অথবা স্পোর্টস) কাজে অংশগ্রহণ করি।

৫। স্পষ্ট ও সঙ্গতিপূর্ণ কাজের সীমানা

– আমি আমার কাজের জন্য একটি সুস্থ সীমানা পরিবেশ নির্ধারণ করি এবং তা মেনে চলি। কাউকে আমার কাজ করে দেওয়ার সুযোগ দেই না এবং প্রয়োজনে "না" বলার দরকার হলেও আমি তা করি।

৬। জীবন দক্ষতা

– বিদ্যালয়ে ভালভাবে কাজ করার মত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা আমার আছে।

কাজ-১

ঘটনা-১:
ঘটনা-২:

আপনার জীবনের দু'টি দুঃখজনক ঘটনা উল্লেখ করুন এবং এসব দুঃখজনক ঘটনার পর স্বাভাবিক আবস্থায় ফিরে আসতে কোন বিষয়গুলো সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে বলে আপনি মনে করেন?

পর্ব-খঃ ব্যক্তিগত স্থিতিস্থপকতা বৃদ্ধির সূচক

শিক্ষার্থীবৃন্দ, এতক্ষণ আমরা স্থিতিস্থপকতার ধারণা এবং স্থিতিস্থাপকতা কুইজ নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার আমরা স্থিাতিস্থাপকতার সূচক নিয়ে আলোচনা করব। দুঃখ পাওয়ার পেছনে যেমনঃ কিছু কার্যকর কারণ বা উপাদান কাজ করে তেমনি দুঃখ লাঘবে কিছু উপাদান বা কারণ ভূমিকা রাখতে পারে। যেসব উপাদান বা কারণ স্থিতিস্থাপকতায় সাহায্য করে তাই হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতার সূচক।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা স্থিতিস্থাপকতার সূচকগুলো শনাক্ত করি এবং লেখা শেষে মূল শিখনীয় বিষয়বস্তু পড়ে এ সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে আরও সমৃদ্ধ করি।

কাজ-১

ইউনিট–৩ অধিবেশন–৬

মূল শিখনীয় বিষয়

স্থিতিস্থাপকতা (স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সম্ভাবনাঃ Resiliency

স্থিতিস্থাপকতা

সুখ দুঃখ নিয়েই আমাদের জীবন। দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা কাজের মধ্যে থাকি। এর মধ্যে পরিবারে, চাকুরির ক্ষেত্রে কিংবা আত্মীয় স্বজনের যে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তখন আমরা স্বাভাবিকভাবেই ভেঙ্গে পড়ি, দুঃখ পাই। কোন কাজ সুন্দরভাবে করা ইচ্ছা থাকলেও সুষ্ঠুভাবে করতে পারি না। কিংবা কাজটি করতে সময় লেগে যায়। কিছুদিন পর আমরা স্বাভাবিক হয়ে যাই কারণ আমাদের দুঃখ, মনের আঘাত, মানসিক চাপ ইত্যাদি আস্তে আস্তে কমতে শুরু করে। যত তাড়াতাড়ি আমরা এ অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসব ততই আমরা দৃঢ় মনোবল নিয়ে আমাদের জীবনের সাথে জড়িত যে কোন কাজকে সুন্দরভাবে সঠিক সময়ে সম্পন্ন করতে পারব। এই দুঃখ, বেদনা ও মানসিক চাপ ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনাকেই বলে স্থিতিস্থাপকতা।

বণি বার্ণাড (Bonnie Bernard) এর মতে, "Resiliency is the simple natural out come of healthy human development in which the personality and environmental influence interact in a reciprocal, transactional relationship".

স্থিতিস্থাপকতা কুইজ(The Resiliency Quiz)**ঃ হেল্ডারসন, এম.এম.ডবি- উ**

১ম অংশঃ

আপনার জীবনে এমন কোন অবস্থা এসেছে কি, যা থেকে আপনি পূর্বের স্থিতাবস্থায় ফিরে আসতে পারেন? বিভিন্ন ধরনের গবেষণা থেকে অনেকেই এ বিষয়ে উপকৃত হয়েছেন। প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে দুঃখ, কষ্ট, বেদনা ও বিপদ আসে। এতে নানা ধরনের মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে হয়। গবেষণা থেকে দেখা গেছে, কিছু কিছু বিষয় নিয়ে চিন্ড্র করলে এ ধরনের সমস্যা থেকে পরিত্রান পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে নিচের

বিষয়গুলো পড়ুন। আপনা উত্তর "হ্যাঁ" হলে আনন্দিত হোন এবং উত্তর "না" হলে কি করলে এর উত্তর "হ্যাঁ" তে পরিবর্তন করতে পারেন তা চিন্তা করুন।

১। আদর সোহাগ এবং সহায়তা (Caring and support)

– আমার জীবনে আমি এমন অনেক ব্যক্তির সাহচর্যে এসেছি যারা আমাকে নিঃশর্ত ভালবাসেন, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং আমার মনে হয় তারা আমার জন্যই সেখানে আছেন।

– আমি একটি বিদ্যালয়ে সাথে কাজে সংযুক্ত আছি। সেখানে আমি আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করি। আমি সেখানে তাদের সাথে দলগত কাজও করি। যাদের সাথে আমি কাজ করি তারা সকলেই যার যার কাজে দক্ষ। আমি তাদের কাজকে শ্রদ্ধার সাথে দেখি এবং তাদের কাজকে মূল্যায়ন করতে পারি।

–আমি আন্তরিকতা (**Kindness**) ও ধৈর্য্যের (**Compassion**) সাথে নিজেকে পরিচালনা করি ও নিজের পরিচর্যা করি (খাওয়া, ঘুম, ব্যায়াম ইত্যাদি)।

২। সফলতার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা (High Expectations for success)

– আমি জীবনে এমন অনেক ব্যক্তির সন্ধান পেয়েছি যারা বিশ্বাস করেন যে, জীবনে সফলতা লাভ করার মত সক্ষমতা আমার আছে।

– আমার কর্মক্ষেত্রে (বা বিদ্যালয়ে) আমি প্রায়ই নিজের সম্পর্কে মন্তব্য শুনি। যেমন– "তুমি তোমার কাজে সফল হবেই।"

– অধিকাংশ সময়ই আমি নিজের সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করি। আমি বিশ্বাস করি যে, নানা রকমের অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমি আমার কাজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব।

৩। অর্থপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ(Opportunities for Meaningful Participation)

– আমার সাথে যাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে তাঁরা কোন বিষয়ে আমার পছন্দ, অপছন্দ ও মতামত শোনেন এবং আমার মতামতের মূল্য দেন।

– আমার মতামত ও ধারণা বিদ্যালয় বা কর্মস্থলের সকলের দ্বারা সমাদৃত হয়।

– আমি যে কোন প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয় এবং কমিউনিটিতে বিনা পারিশ্রমিকে কাজে সহযোগিতা করি।

৪। ইতিবাচক অঙ্গীকার (Positive Bonds)

– বিদ্যালয় ছুটির পর বা কাজ শেষে আমি আমার শখের কাজগুলি করি।

– কর্মক্ষেত্রে/ বিদ্যালয়ের কাজের বাইরেও আমি এক বা একাধিক দলের সাথে (ক্লাব, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় অথবা স্পোর্টস) কাজে অংশগ্রহণ করি।

– আমি মনে করি কর্মক্ষেত্র বা বিদ্যালয়ের অনেকেই আমার খুব ঘনিষ্ঠ।

৫। স্পষ্ট ও সঙ্গতিপূর্ণ কাজের সীমানা (Clear and Consistent Boundaries)

– আমি আমার কাজের জন্য একটি সুস্থ সীমানা পরিবেশ নির্ধারণ করি এবং তা মেনে চলি। কাউকে আমার কাজ করে দেওয়ার সুযোগ দেই না এবং প্রয়োজনে "না" বলার দরকার হলেও আমি তা করি।

– অধিকাংশ বন্ধু-বান্ধব এবং পারিবারিক সদস্যদের সাথে আমার ভাল ও সুস্থ সম্পর্ক রয়েছে (যেমন: পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং প্রত্যেকের সাথে কিছু আদান প্রদানের সম্পর্ক)।

- কর্মক্ষেত্রে/বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন, প্রত্যাশা ইত্যাদি সম্পর্কে আমার স্বচ্ছ অভিজ্ঞতা আছে।

৬। জীবন দক্ষতা (Life Skills)

– বিদ্যালয়ে ভালভাবে কাজ করার মত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা আমার আছে।

– মনোযোগ সহকারে শোনা, সততার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার মত ক্ষমতা আমার আছে এবং আমি এগুলোর সদ্ব্যবহার করি।

– কর্মক্ষেত্রে/ আমি জানি কীভাবে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয় এবং পর্যায়ক্রমে তা অর্জন করতে হয়।

২য় অংশঃ

গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে যে কোন ব্যক্তির সংকটকালে, প্রচন্ড মানসিক চাপ থাকাকালে অথবা আঘাতের ফলে স্নায়ুরোগের সম্মুখীন হলে সে নিজের গুণগতমান উন্নয়নের দ্বারা তার জীবনের সমস্যাসমূহ ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠতে পারে। নিচের তালিকাটিতে "ব্যক্তিগত স্থিতিস্থাপকতা" বৃদ্ধির কিছু সূচক ম্যানু হিসেবে চিন্তা করা

যেতে পারে। এই তালিকায় কারো জন্যই প্রয়োজনীয় সবকিছু নেই। এতে অগ্রসর হওয়া কঠিন হলেও আপনি হয়তো স্বাভাবিকভাবেই এসব গুণাবলীর ৩ বা ৪টি প্রায়ই অনুসরণ বা ব্যবহার করেন।

আপনার প্রাথমিক স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির কোন সূচকগুলো পূর্বে কীভাবে ব্যবহার করেছেন এবং আপনার জীবনের বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য আপনি এগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করবেন তা আপনার জানা প্রয়োজন। আপনি যদি মনে করেন যে ম্যানুটিতে আপনি ২/১টি স্থিতিস্থাপকতা সূচক যোগ করতে চান যা আপনার খুবই প্রয়োজন সে সম্পর্কে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

ব্যক্তিগত স্থিতিস্থপকতা বৃদ্ধির সূচকঃ (ব্যক্তিগত গুণাবলী যা স্থিতিস্থাপকতার বা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসার সহায়ক) ঃ

আপনি প্রায়ই ব্যবহার করেন এমন ৩/৪টি স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির সূচক এর পাশে প্লাস (+) চিহ্ন দিন। চিন্তা করুন আপনি অতীতে কিংবা সম্প্রতি কীভাবে এগুলির ব্যবহার করেছেন। সাম্প্রতিক কালে আপনি জীবনের কোন সমস্যায় সঙ্কটকালে অথবা চাপ কিংবা কষ্টকর পরিস্থিতিতে কীভাবে এই স্থিতিস্থাপকতা সূচকসমূহের সর্বাধিক প্রয়োগ করতে পারেন তা ভাবুন।

আপনি ভেবে দেখুন, আপনার ব্যক্তিগত সংগ্রহে এমন ২/১টি স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির সূচক আছে কিনা, যা আপনি এগুলোতে যোগ করতে পারেন। যেমন:

- ❖ সম্পর্ক (Relationship) - মিশুক, সঙ্গপ্রিয়/ বন্ধু হবার মত সক্ষম/ ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তোলার সামর্থ্য।
- ❖ রসিকতা (Humor) –রসবোধ আছে।
- ❖ অভ্যস্ড়রীণ নির্দেশনা (Inter direction) –পছন্দের ভিত্তিতে/ অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- ❖ উপলব্ধির ক্ষমতা (Perceptiveness) – অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মানুষ ও পরিস্থিতির উপলব্ধি।
- ❖ স্বাতন্ত্র্য (Independence) –অসুস্থ লোকজন বা বিপদজনক পরিস্থিতি থেকে দূরত্ব বজায় রেখে খাপ খাওয়ার ক্ষমতা/ স্বাতন্ত্র্য।

- ব্যক্তিগত ভবিষৎ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ (Positive View of Personal Future)- আশাবাদ ইতিবাচক ভবিষৎ আকাঙ্ক্ষা।
- নমনীয়তা (Flexibility) –পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারা; পরিস্থিতির সাথে তাল মিলানোর জন্য যথাসম্ভব নমনীয়তা প্রদর্শন করা।
- শিখনের প্রতি ভালবাসা (Love of Learning)– শেখার ক্ষমতা এবং শেখার সাথে যোগাযোগ।
- আত্ম-প্রেষণা (Self Motivation) –অভ্যন্তরীণ উদ্যোগ বা ভিতর থেকে প্রণোদনা সৃষ্টি।
- যোগ্যতা (Competence) –কোন কিছুতে ভাল/ব্যক্তিগত যোগ্যতা।
- স্বমূল্যায়ন (Self Worth) –স্বমূল্যায়ন এবং অত্মবিশ্বাসের অনুভূতি।
- আধ্যাত্মিক গুণ (Spirituality) –কোন কিছুর প্রতি অগাধ বিশ্বাস।
- অধ্যবসায়ী (Perseverance) (নিরবিচ্ছিন্ন মনোযোগ) –অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও কোন কাজ করতে থাকা বা ছেড়ে না দেয়া।
- সৃজনশীলতা (Creativity)–সুরুচিসম্পন্নভাবে নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টা।

নিচের বিষয়গুলো যদি করা হয় তাহলে আপনি নিজেকে সবচেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপক হতে সাহায্য করতে পারেন অথবা যে কাউকে আরও বেশি স্থিতিস্থাপক করতে পারেন।

১। স্থিতিবস্থার মনোভাব সঞ্চারিত করে যা আপনি ভুল মনে করেন, তার চাইতে আপনি যা সঠিক বলে মনে করেন সেটি অনেক বেশি শক্তিশালী।

২। ব্যক্তির সমস্যাগত দিক বা দুর্বল দিকের চেয়ে সবল দিকের প্রতি অধিক মনোযোগী হলে কিংবা সবল দিকগুলো কীভাবে সমস্যা দূরীকরণে ব্যবহার করা যায় এসম্পর্কে নিজেকে প্রশ্ন করলে একদিকে এটি আপনার নিজেকে সাহায্য করার জন্য ব্যবহার হতে পারে, অন্যদিকে দ্বিতীয় অংশে "স্থিতিস্থাপকতা কুইজ" এর তালিকায় ব্যক্তিগত স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির সবচেয়ে ভাল সূচক হিসেবে সনাক্ত করা যেতে পারে।

৩। ধৈর্য্য থাকলে (Endurance) সফলতার সাথে তাৎপর্যপূর্ণ আঘাতের ফলে সৃষ্ট স্নায়ুরোগ কিংবা সঙ্কটকাল থেকে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসা যায় তবে এটি সময়ের ব্যাপার।

মূল্যায়নঃ

১. স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন। ব্যক্তিগত স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির সূচকসমূহ চিহ্নিত করুন।

২. স্থিতিস্থাপকতা কুইজ বাস্তবে কীভাবে প্রয়োগ করবেন- আলোচনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক ও খ

কাজ-১

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।